রোমহর্ষক

কিশোর থ্রিলার

যাও এখান থেকে

জাফর চৌধুরী

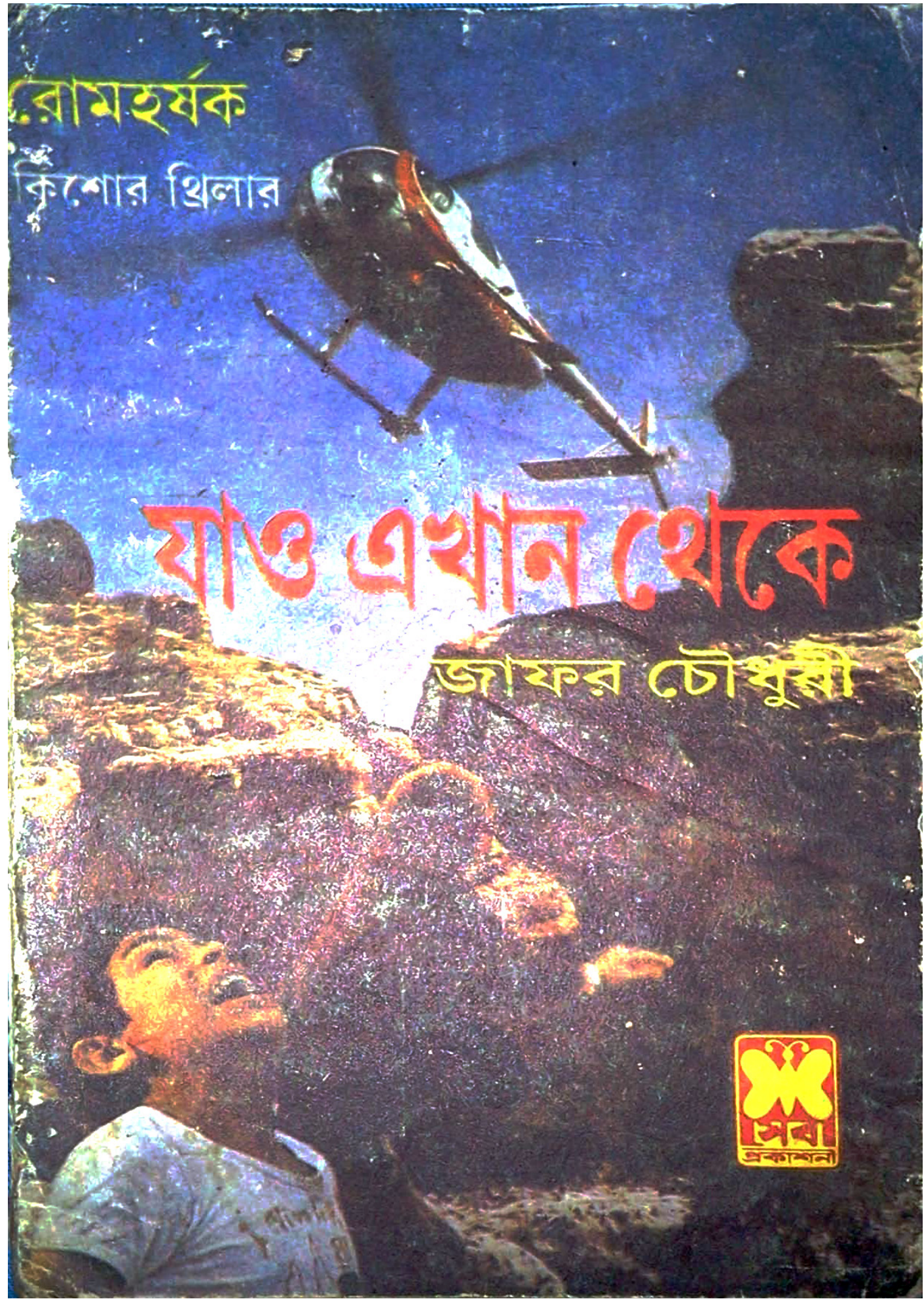

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-৪২

রোমহর্ষক সিরিজের প্রথম বই

যাও এখান থেকে

জাফর চৌধুরী

ছুটি কাটাতে বেরিয়েছিলো দুই ভাই, রেজা আর সুজা।
রুক্ষ, ঊষর অঞ্চলে ঢুকে খারাপ হয়ে গেল গাড়ি,
ধুঁকতে ধুঁকতে পৌঁছলো ছোট্ট ওয়েস্টার্ন শহর
অ্যাক্সরেড-এ। তাদের উদ্দেশ্য জেনে
থমকে গেল মেকানিক। দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়লো
সমস্ত শহরে। তাজ্জব হয়ে গেল দুই ভাই।
যার কাছেই যায়, এক কথা : যাও এখান থেকে!
প্রথমে সাবধান করা হলো ওদের, তারপর এলো আঘাত।
সারা শহরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো দুই ভাই,
বোকার মতো চ্যালেঞ্জ করে বসলো মহাপরাক্রমশালী,
খুনী, ভয়ংকর শত্রুকে। প্রাণের পরোয়া করলো না…

আঠার টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কিশোর থ্রিলার-৪২

রোমহর্ষক সিরিজের প্রথম বই

যাও এখান থেকে

জাফর চৌধুরী

সেবা প্রকাশনী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

JAO EKHAN THEKEY
By : Jafor Choudhury

পরিচয়

বাঙ্গালী দুই ভাই, রেজা মুরাদ আর সুজা মুরাদ।
বাবা-মায়ের সংগে থাকে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের
ছিমছাম সুন্দর শহর বেপোর্ট-এ।
বাবা মিস্টার ফিরোজ মুরাদ দুঁদে গোয়েন্দা।
বাবার মতোই গোয়েন্দা হতে চায় দুই ভাই,
অ্যাডভেঞ্চার পাগল।
সুযোগ পেলেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালায়,
ভয়ংকর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হয় মৃত্যুর মুখোমুখি।
বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ, সুদর্শন ওই দুই তরুণকে নিয়েই
রোমহর্ষক সিরিজের কাহিনী।

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক।

এক

'ওয়াটার পাম্পটা গেছে।' ভ্যানের স্তব্ধ এঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে আছে সুজা মুরাদ। দরদর ঘামছে কড়া রোদে। ঘামে ভেজা কপালে লেপটে রয়েছে সতেরো বছর বয়েসী সোনালি চুল।

মাথা নাড়লো তার ভাই রেজা। বয়েসে এক বছরের বড়, লম্বায় ইঞ্চিখানেক। তবে আঠারো বছরের তুলনায় বড় হয়ে গেছে শরীর, দেখলে মনে হয় পঁচিশ বছরের যুবক। কঠিন পেশীবহুল দেহ। বাবার কালো চুল পেয়েছে, মায়ের সোনালি নয়। কিন্তু স্বভাব মায়ের মতো শান্ত, ধীর-স্থির। আর সুজা হয়েছে একেবারে উল্টো। বাবার মতো একগুঁয়ে, হাসিখুশি, কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল।

'মাথা নাড়ছো কেন?' ভাইয়ের দিকে তাকালো সুজা। 'বললাম তো পাম্পটা গেছে।'

'না। গেছে ফ্যান বেল্ট।'

'আমার তা মনে হয় না,' দড়াম করে এঞ্জিনের ওপরের হুড নামালো সুজা। 'যে রকম গরম হয়েছে, আওয়াজ করছিলো, শিওর ওয়াটার পাম্প। কসম।'

গলার রঙিন ওয়েস্টার্ন রুমালটা খুলে ক্যানটিন থেকে পানি ঢেলে ভিজিয়ে, মাথার ওপর চিপে দিলো রেজা। 'আবার কসম?' হেসে বললো সে। 'এই নিয়ে ক'বার কসম খাওয়া হয়েছে? শুরু থেকেই তো কসম কসম। এটা দারুণ রাস্তা, কসম! উড়ে যাবো এপথ দিয়ে, কসম! রাস্তাটা সরু বটে, কিন্তু চমৎকার, কসম! ...যা তোর চমৎকার রাস্তার ছিরি! গ্যাস স্টেশন নেই, ফোন নেই, গাড়ি নেই, ট্রাক নেই, সাহায্যের ভরসা নেই...'

'হয়েছে হয়েছে, থামো থামো!' দু'হাত তুললো সুজা। 'বকা-বকির অনেক সময় পাবে। ক্যানটিনটা তো দাও আগে, মরে গেলাম। আরিব্বাপরে কি গরম! ক...' হঠাৎ থেমে গেল সে।

হেসে ফেললো রেজা। 'থামলি কেন? এবার কসমটা তো ঠিকই আছে,' ক্যানটিনটা তুলে দিলো ভাইয়ের হাতে। 'ভীষণ গরম।'

রুমাল খোলার ধার দিয়েও গেল না সুজা, ক্যানটিনের খোলা মুখটা মাথার ওপর উপুড় করে ধরলো।

'আরি আরি, করছিস কি!' তাড়াতাড়ি বাধা দিলো রেজা। 'পানি সব ফেলে দিলে এই গরমে ছাতি ফেটে মরবো তো।'

আশপাশে তাকালো ওরা। শূন্য নির্জন শুষ্ক সমতল প্রেইরি। দূরে তামাটে আকাশ ফুঁড়ে মাথা তোলার চেষ্টা করছে যেন রুক্ষ বাদামি পর্বত। বাড়িঘরের চিহ্নও চোখে পড়ছে না। রোদে পোড়া শুকনো ঝোপগুলো যেন এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

'এ-তো মরুভূমি,' বিড়বিড় করলো রেজা।

'ভুল বললে, দাদা,' শুধরে দিলো সুজা, 'মরুভূমি নয়, শুরুই

হয়নি। ম্যাপটা যে কোথায় হারালাম!'

'মরুভূমিই। এই গরমে বেপোর্ট থেকে বেরোনোই উচিত হয়নি আমাদের।'

আমেরিকার পূর্ব উপকূলের একটা ব্যস্ত শহর বেপোর্ট। বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, ব্যবসাকেন্দ্রে ঠাসা, সর্বক্ষণ প্রাণচঞ্চল। পশ্চিমের এই ওয়াইওমিং-এর শহরগুলোর মতো নয়। এখানে এখনও যেন সেই দেড়-দু'শো বছরের পুরনো বুনো পশ্চিমের গন্ধ লেগে রয়েছে। মরু অঞ্চল, রুক্ষ পাহাড়, দিগন্তজোড়া প্রেইরি, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা গত এক হপ্তায়। স্কুল বন্ধ, গরমের লম্বা ছুটি। পশ্চিমের ন্যাশনাল পার্কগুলো দেখতে এসেছে দুই ভাই। বনেবাদাড়ে ঘুরবে, পাহাড়ে চড়বে, বুনো জীবন দেখবে, রাতে আগুনের পাশে শুয়ে ঘুমাবে, এই ইচ্ছে।

গাড়ির গায়ে হেলান দিতে গিয়ে ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে আনলো রেজা। বিকেলের রোদে আগুনের মতো তেতে আছে ধাতু, ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে হাতে! কনুইয়ের কাছে হাত বোলাতে বোলাতে বললো সে, 'তখনই বলেছিলাম, বাড়িতেই এবারের ছুটিটা কাটাই, রাজি হলি না। গরমের সময় এই মরুভূমিতে মানুষ আসে? বেপোর্টের আশেপাশে কি দেখার জায়গা নেই...'

'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কি লাভ?' বাধা দিয়ে বললো সুজা। 'যা হওয়ার তো হয়েছে। এখন কি করা যায় তা-ই বলো।'

'ম্যাপটাও নেই। কোথায় যে যাচ্ছি সেটাও বুঝতে পারছি না ঠিকমতো। তোর কি ইচ্ছে?'

'এগিয়ে যাবো, যতোক্ষণ এঞ্জিন চলে। এখানে বসে থাকার যাও এখান থেকে

কোনো মানে হয় না। গা গরম, হাঁটাও যাবে না।'

'তোর বিশ্বাস, আবার চালু হবে এঞ্জিন?'

'নিশ্চয়। কসম...'

হেসে ফেললো রেজা। গম্ভীর ভাব দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। আবার গাড়িতে উঠলো দু'জনে।

সুজার অনুমান ঠিক। প্রথম চেষ্টায়ই চালু হয়ে গেল এঞ্জিন, তবে তীক্ষ্ণ একটা হিসহিস শব্দ বেরোচ্ছে রেডিয়েটর থেকে।

'সামনের শহরটা কদ্দূর কে জানে,' রেজা বললো। 'পৌঁছতে পারলে হয়।'

এঞ্জিনের ওপর যাতে চাপ বেশি না পড়ে, গতি কম রাখলো সে। বিশ মিনিট পর মাইল দশেক পেরিয়ে সামনে দেখতে পেলো একটা শহর।

'কি, বলেছিলাম না,' ড্যাশবোর্ডে চাপড় মেরে বললো সুজা। 'ঠিক পৌঁছে দেবে।'

শহরে ঢোকার মুখে একটা সাইন বোর্ড, তাতে লেখা:

কেমন আছেন, ভাই?
শহরের তিনশো জন বন্ধুর তরফ থেকে
অ্যাক্সব্রেড-এ স্বাগতম।

'তারমানে লোক সংখ্যা তিনশো,' রেজা বিড়বিড় করলো। 'এখন বন্ধুদের মাঝে একজন মেকানিক থাকলেই বাঁচি, ফ্যান বেল্টটা যে মেরামত করে দিতে পারবে।'

'ওয়াটার পাম্প,' শুধরে দিয়ে বললো সুজা, 'খারাপ হয়েছে ওয়াটার পাম্প। আরও সাইন বোর্ড, ওই যে, রাস্তার ধারে। মনে হচ্ছে ন্যাশনাল পার্ক আছে একটা।'

আরও দশ মিনিট পর বিকট শব্দ করতে করতে ধীর গতিতে শহরে ঢুকলো ভ্যান, চললো অ্যাক্সরেডের প্রধান সড়ক ধরে। এক-সারি একতলা দালান পেরিয়ে এলো, ছোট, পুরনো, রঙচটা। একটা স্টোরের সামনে বসে গল্প করছে কয়েকজন বুড়ো, চেয়ারগুলোর পিঠ বাড়ির দেয়ালে ঠেকানো।

দেখে দুই ভাইয়ের মনে হলো, প্রায় সবই একটা করে আছে অ্যাক্সরেডে—রেস্টুরেন্ট, লণ্ড্রি, ব্যাংক, ওষুধের দোকান, মোটেল। শহরের শেষ মাথায় গ্যারেজও পাওয়া গেল একটা, নাম, ডিন মার্ট'স গ্যারেজ।

ধুলোয়-ধূসর দুটো গ্যাস পাম্প পেরিয়ে গ্যারেজের খোলা ফটকের সামনে গাড়ি রাখলো রেজা।

ছেঁড়া কাপড়ে হাতের কালি মুছতে মুছতে বেরোলো এক তরুণ, বয়েস একুশ কি বাইশ। গাঢ় নীল রঙের হ্যাটের নিচ দিয়ে বেরিয়ে আছে লালচে চুল। গোল মুখ। টকটকে লাল শার্টের যেখানে সেখানে তেল-কালির ছাপ। দেখে মেকানিক বলে মনে হয় না, যেন সত্তা কোনো রক-সিঙ্গার। তার প্রায় পায়ের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বড় একটা কুকুর, বেশ বয়েস, শাদা, চামড়ায় কালো ফুটকি।

'এইই যে, কি ব্যাপার?' হেসে বললো মেকানিক, তিনশো বন্ধুর একজন। ভাবসাবে মনে হলো, শহরে নতুন মুখ দেখে খুশি হয়েছে।

মাটিতে শুয়ে পড়লো কুকুরটা, প্রভুর পায়ের কাউবয় বুটকে বানালো বালিশ।

'বিপদে পড়েছি,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললো রেজা। 'এঞ্জিনে গোলমাল।'

'দেখি তো,' এগিয়ে এলো মেকানিক, নিচ থেকে বালিশ সরে যাওয়ায় মাটিতে পড়ে গেল কুকুরের মাথাটা। কিছু মনে করলো না জানোয়ারটা, চোখ মুদলো।

ড্রাইভিং সিটে সরে এসে এঞ্জিন স্টার্ট দিলো সুজা।

হুড তুললো মেকানিক। কান পেতে এক মুহূর্ত এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে মাথা ঝাঁকালো। 'হুঁ, বুঝেছি। ওয়াটার পাম্প।'

ঝট করে ভাইয়ের দিকে তাকালো সুজা, চোখে কি-বলেছিলাম-না দৃষ্টি। নামলো গাড়ি থেকে।

'ফ্যান বেল্টও খারাপ হয়ে গেছে,' আবার বললো মেকানিক।

ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে আমার-আন্দাজও-ভুল-নয় হাসি হাসলো সুজা।

'খবর তো দুটোই খারাপ শোনালেন, ভাই,' মেকানিককে বললো রেজা। 'ভালো কিছু শোনান এবার। ঠিক হবে?'

'পার্টস পেলে দশ মিনিটের কাজ। কিন্তু আমার কাছে নেই। আনাতে দু'তিন দিন লাগবে।'

'দুই-তিন দিন?' হতাশা ঢাকতে পারলো না রেজা। 'মেরামত হয় না?'

'না, সরি। পারলে করে দিতাম। তা কোথায় যাচ্ছিলেন?' রেজাকে নিজের চেয়ে বয়েসে বড় ভাবলো মেকানিক।

'ক্যাম্পিং ট্রিপ,' সুজা জবাব দিলো। 'এই এলাকার চারটে ন্যাশনাল পার্ক দেখতে বেরিয়েছি।'

কথাটা শুনে কঠিন হয়ে গেল মেকানিকের মুখ, ইস্পাতের ফাঁদের মতো চেপে বসলো যেন চোয়াল। 'তা-ই!' বললো সে, তাকাচ্ছে

না দু'জনের কারও দিকেই। 'সামনে আরেকটা গ্যারেজ আছে, ওখানে গেলে গাড়ি সারাতে পারবেন।' মুখ না ফিরিয়ে বলল ন্যাকড়া দিয়ে ভ্যানের হেডলাইট মুছতে শুরু করলো সে। 'যদি পার্টস থাকে।'

'সুজা,' ভাইয়ের দিকে ফিরলো রেজা, 'এক কাজ তো করতে পারি আমরা। গাড়িটা এখানে থাক, আমরা গিয়ে পার্কে থাকবো। এদিকে গাড়িও ঠিক হয়ে যাক, আমরাও ওদিকে দেখাটা সেরে ফেলি। কি বলো?'

রেজা জবাব দেয়ার আগেই মেকানিক বললো, 'কষ্ট করার কি দরকার? সামনেই লটন, এখান থেকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল। শহরটা বড়, কয়েকটা গ্যারেজ আছে, পার্টস নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ওখানে গেলেই সারিয়ে নিতে পারবেন।'

'যেতে পারলে তবে তো সারানো,' সুজা বললো। 'ভ্যানটা কি যাবে অতদূর?'

'নিশ্চয় যাবে,' বললো বটে, কিন্তু মেকানিকের গলায় জোর নেই, মুখও তুললো না।

বুঝতে পারছে সুজা, মিথ্যে কথা বলছে মেকানিক। পঁয়তাল্লিশ মাইল কিছুতেই যাবে না ভ্যান, বরং আরও ক্ষতি হবে এঞ্জিনের। অ্যাক্সেলেরেডে যে আসতে পেরেছে, এই ঢের। কিন্তু কেন মিথ্যে বলছে লোকটা?

ভাইকে বললো সুজা, 'দাদা, তোমার প্রস্তাবটা ভালোই।' আড়চোখে মেকানিকের দিকে তাকিয়ে আছে সে, লোকটার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে চাইছে। 'শুধু ভালো না, খুব ভালো।

চমৎকার।'

'ভালো হবে না,' ভোঁতা গলায় বললো মেকানিক। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। তেল লেগে আছে হাতে, উল্টো পিঠ দিয়ে মুছলো ঘাম।

'কেন?'

জবাব দিলো না মেকানিক। গিয়ার নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো,'আরেক কাজ করতে পারো,' সুজার দিকে তাকালো সে, 'মোটেলে ওঠার টাকা না থাকলে আমার বাড়িতে থাকতে পারো। প্রাসাদ নয়, তবে মাথার ওপরে শক্ত একটা ছাত পাবে।' হাসলো। হাসিটা মেকি না আন্তরিক বোঝা মুশকিল।

এরকম আচরণ করছে কেন লোকটা? দু'জনেই অবাক। সতর্ক হয়ে উঠেছে তাদের গোয়েন্দা-মন। বাবার মতো দুঁদে গোয়েন্দা এখনও হতে পারেনি, কিন্তু সুযোগ পেলেই রহস্যভেদের চেষ্টা করে। তাজা মাছের গন্ধ পেলে বেড়াল যেমন ছোঁক ছোঁক করে, রহস্যের গন্ধ পেলে ওরাও হয়ে ওঠে অনেকটা তেমনি। ইচ্ছে আছে, অন্তত সুজার, বড় হয়ে গোয়েন্দাগিরিকে পেশা হিসেবে বেছে নেবে। বাবার অফিস দখল করবে।

খুব ছোট বেলায় ভাগ্য ফেরাতে সুদূর বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন তাদের বাবা মিস্টার ফিরোজ মুরাদ। খবরের কাগজ ফেরি থেকে শুরু করে কসাইখানায় হেলপারের চাকরি, অনেক কাজই করেছেন। ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে গেছেন পড়াশোনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ভর্তি হয়েছিলেন আমেরিকান পুলিশ বাহিনীতে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে ধাপে ধাপে উঠেছেন

ওপরে, উন্নতির শিখরে ওঠার আগেই হুম করে ছেড়ে দিলেন চাকরি। একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে বসলেন।

আবার প্রমাণ করলেন নিজের যোগ্যতা। অনেকগুলো জটিল রহস্যের সমাধান করে খ্যাতি অর্জন করলেন, সেই সঙ্গে টাকা।

আমেরিকার নাগরিকত্ব অনেক আগেই পেয়েছেন তিনি। বিয়ে করেছেন এক আমেরিকান মহিলাকে। পূর্ব উপকূলের শহর বেপোর্টে বাড়ি করেছেন, অফিস করেছেন। সেখানেই বসার ইচ্ছে ছোট ছেলে সুজার। রেজা কি করবে, এখনও ঠিক করেনি। তবে ইচ্ছে আছে পুলিশে ঢুকবে, চান্স পেলে নেভিতে।

মেকানিকের কথাবার্তায় অসামঞ্জস্য দু'জনেই লক্ষ্য করলো। রেজার দিকে আড়চোখে তাকালো সুজা। দু'জনের মনে একই ভাবনা, বারবার মত পরিবর্তন করছে কেন লোকটা? প্রথমে খুব আন্তরিক, তারপর তাদেরকে বিদায় করে দেয়ার চেষ্টা, শেষে তার বাড়িতেই থাকতে বলা, কেন? তাকিয়ে রইলো মেকানিকের দিকে, চোখে সন্দেহ।

'আরে, ওভাবে কি দেখছো? কি হয়েছে?' পরিবেশ হালকা করার চেষ্টায় হাসলো মেকানিক। 'ওহ্‌হো, আমার নামই তো এখনও বলিনি। মার্ট, আমি ডিন মার্ট।' হাত বাড়িয়ে দিলো সে। 'শুধু ডিন বললেই চলবে।'

'আমি রেজা মুরাদ,' মেকানিকের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো রেজা। 'ও আমার ছোট ভাই, সুজা।'

'তো কি ঠিক করলে? আমার বাসায়ই থাকবে?'

'থ্যাংক ইউ, ডিন,' সুজা বললো। 'পশ্চিমে এসেছিই প্রকৃতির

স্বাদ নিতে। পাইন পাতার সুবাস আর ধোঁয়ার গন্ধ নিতে চাই আমি, মাথার ওপরে বাংকে শোয়া বড় ভাইয়ের মোজা পরা পায়ের দুর্গন্ধ নয়।'

'কাজটা ঠিক হবে না।'

'হ্যাঁ, দু'বার বললেন। কিন্তু কেন মানা করছেন? বাইরে কিসের ভয়?'

কেশে গলা পরিষ্কার করলো ডিন। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললো, 'ভালুক!'

'বাচ্চা খোকাকে জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন, না?' কড়া কথাটা নরম করার জন্যে হাসলো সুজা। 'আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো? পার্কে শুটিং হচ্ছে? বড় কোনো অভিনেতা এসেছে? লোকে গিয়ে বিরক্ত করবে বলে...'

'আরে না, না,' হাসতে হাসতে মাথা নাড়লো মেকানিক। 'আসলেই ভালুক। অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে। পাগল হয়ে গেছে বোধহয় কোনো একটা জানোয়ার। পার্কে মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে। একজন তো মরতে মরতে বেঁচে এসেছে। মোটেই নিরাপদ না।'

'ন্যাশনাল পার্কে ভালুক থাকে, এটা জেনেশুনেই থাকতে এসেছি আমরা,' গম্ভীর হয়ে বললো রেজা।

'বেশ, আপনাদের ইচ্ছে। পরে বলতে পারবেন না মানা করিনি,' হাত নাড়লো ডিন।

না, বলবো না, মনে মনে বললো রেজা। একটা ভালুকের ভয়ে পিছিয়ে আসবো আমি, ভাবলো কি করে লোকটা? নাকি আর

কোনো কারণ আছে ? বললো, 'তাহলে ওই কথাই রইলো। পার্টস আনিয়ে গাড়িটা সারান আপনি, আমরা গিয়ে আমাদের কাজ সারি।'

গাড়িতে উঠে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত হলো রেজা। কাপড়-চোপড়, খাবার, স্লিপিং ব্যাগ, সব নিয়ে এসেছে। ব্যাগে ভরা। এক এক করে ব্যাগগুলো নিয়ে সুজার হাতে দিলো, সে নামিয়ে রাখলো মাটিতে।

দুটো ব্যাকপ্যাক-এ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে পিঠে বেঁধে নিলো দু'জনে। মেকানিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলো পশ্চিমে।

রাস্তা ধরে দ্রুত হাঁটছে। নয় মাইল পর বদলে যেতে লাগলো প্রকৃতি। ঘাসে ঢাকা চ্যাপ্টা সমভূমি গিয়ে মিশেছে ঘন বনের সঙ্গে, ওখান থেকেই বিশাল ন্যাশনাল পার্কের শুরু।

পথ থেকে নেমে সমভূমির ওপর দিয়ে এগোলো ওরা। বনে ঢুকে সোজাসুজি হাঁটলো আধ মাইল, উত্তর দিকে। বনের মধ্যে ছোট্ট এক চিলতে খোলা জায়গা। ক্যাম্প করার জন্যে চমৎকার। শুকনো কাঠের অভাব নেই। কুড়িয়ে এনে বড় করে আগুন জ্বাললো, মেকানিকের ভালুকের গল্প মনে রেখে। এমন কোনো বুনো জানোয়ার নেই যে আগুনকে ভয় পায় না।

কয়েকটা পাইনের মোচা কুড়িয়ে আনলো সুজা। একটা একটা করে ফেলবে আগুনে, সুগন্ধ ছড়াবে মোচাগুলো, সেই সাথে কট্ কট্ কান জুড়ানো শব্দ। ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আগুনে ছুঁড়ে দিলো একটা মোচা।

'সুজা,' মাংসের টিন আর আলু বের করতে করতে বললো রেজা, 'আগের দিনের ওয়েস্টার্ন কাউবয়গুলো সত্যি আরামে ছিলো রে। এই তো জীবন, নাকি বলিস ?'

'একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছো, দাদা।'

আস্ত আলু আগুনে পুড়তে দিয়ে, কাঠিতে গেঁথে মাংস ঝলসাতে লাগলো রেজা। আগুনের মতোই লাল রঙ ছড়িয়ে দিগন্তে দ্রুত অস্ত যাচ্ছে সূর্য। পাইনের বনে গোধূলির ছায়া। যে কোনো মুহূর্তে ঝুপ করে নামবে রাতের অন্ধকার।

রান্না শেষ হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল। খেতে বসলো দুই ভাই। এই পরিবেশে অতি সাধারণ খাবারই মনে হলো যেন অমৃত।

'সুজা, গ্যারেজের মেকানিকটা এরকম ব্যবহার করলো কেন, বলতো ?' মাংস চিবুতে চিবুতে বললো রেজা। 'তোর অবাক লাগেনি ?'

'লেগেছে,' এক কামড়ে অর্ধেকটা পোড়া আলু মুখে পুরে 'আঁউউ' করে উঠলো সুজা। ভীষণ গরম। কোনোমতে সামলে নিয়ে বললো, 'ব্যাটার এঞ্জিন সম্পর্কে ধারণা নেই, আমার যা মনে হয়। তাই একবার বলে এটা খারাপ হয়েছে, আবার বলে ওটা··· আসলে কাজ জানি না বলতে লজ্জা পাচ্ছিলো। এটাওটা বলে আমাদের বিদেয় করার তালে ছিলো।' বাকি অর্ধেকটা আলু মুখে পুরলো সে।

আলু আর মাংস শেষ করে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করলো রেজা।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালো সুজা, 'আমাকে দু'টো দেবে। এক-

টায় হবে না।'

'আছেই তো তিনটে।'

'সে-জন্যেই তো বললাম। তিনটেই চাইতাম, কিন্তু তুমি বড় ভাই, তোমাকে ফেলে...'

'হয়েছে হয়েছে, আর ভজাতে হবে না। নে,' বেছে বেছে বড় দুটো চকলেট ভাইয়ের ছড়ানো হাতের তালুতে ফেলে দিলো রেজা।

'ইচ্ছে করলে অর্ধেকটা নিতে পারো,' হেসে গাল চুলকালো সুজা।

'থাক, লাগবে না। খেয়ে ফেল।' রেজাও হাসলো। গোল করে পাকানো স্লিপিং ব্যাগে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে চকলেট খেতে লাগলো নীরবে। সতর্ক হয়ে উঠলো হঠাৎ। ফিসফিস করে বললো, 'নড়বি না। তাকাবিও না কোনো দিকে। আমাদের ওপর চোখ রাখা হচ্ছে।'

স্থির হয়ে গেল সুজা। চোখ বড় বড়। নিচু কণ্ঠে বললো, 'শুনেছি, ভালুকের মিষ্টি খুব প্রিয়। চকলেট চাইবে না তো?' ভয়ঙ্কর বিপদের মুহূর্তেও রসিকতার লোভ ছাড়তে পারে না সে। 'ভাগ-টাগ দিতে পারবো না বাপু।'

মট করে ভাঙলো একটা ছোট ডাল, বড় ডাল নড়লো। আস্তে ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো রেজা, টর্চের জন্যে। ডাল আবার নড়তেই সোজা আলো ফেললো শব্দ লক্ষ্য করে।

উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে উঠলো বাদামি চোখ। স্পষ্ট দেখা গেল প্রাণীটাকে।

যাও এখান থেকে

'হরিণ,' ফিসফিস করলো সুজা।

'দারুণ !'

ওরা চেয়ে আছে হরিণটার দিকে, ওটাও চেয়ে আছে ওদের দিকে। যেন পরস্পরকে সম্মোহিত করে ফেলেছে তিন জোড়া চোখ। অবশেষে সুইচ অফ করে দিলো রেজা। এক লাফে ঝোপের ভেতর ঢুকে গেল জানোয়ারটা।

চুপ করে আছে দুই ভাই। কান পেতে শুনছে বুনো রাতের শব্দ। ঝিঁঝি আর নিশাচর পাখির ডাকে মুখর হয়ে উঠেছে বন-ভূমি। ইয়া বড় বড় তারা ফুটেছে আকাশে, বনতলে জমাট হতে পারছে না অন্ধকার, আবছা। অনেক ছায়ার নড়াচড়া চোখে পড়ছে। নানা রকম জীব। কোনোটা গাছে চড়ছে, কোনোটা ছুটে যাচ্ছে মাটির ওপর দিয়ে।

'নাহু, ভালুক ভায়া আসবেন না,' সুজা বললো। 'খামোকা দুশ্চিন্তা। অ্যাক্সরেড জায়গা খারাপ নয়। তোমার কেমন লাগছে, দাদা? আমার খুব ভালো লাগছে। বনের হরিণটাও।'

'ভালুকটা ভালো হলেই হয়। উঠে হয়তো দেখবো খাবারের প্লেট নিয়ে হাজির। হাহু হাহু!' ব্যাগের ওপর মাথা রেখে চিত হয়ে শু'লো রেজা। তারার দিকে চেয়ে বললো, 'সুজা, একটা গান গা না। জমবে এখন।'

'তোমার বেহালাটা আনা উচিত ছিলো। কোনটা গাইবো?'

'ওই যে, অনিতাকে যেটা বেশি শোনাস।'

'সে তো অনিতাকে শোনাই, তোমায় কেন?'

'ও যেমন তোর বন্ধু, আমিও তো বন্ধু, তাই না?'

'তা বটে। আচ্ছা দাদা, অ্যানিটা বলতে তোমার ভাল্লাগে না, না? কিংবা অ্যানি?'

'লাগে। তবে অনিতা অনেক মধুর। অনি বলেও ডাকতে পারিস।'

'গোয়েন্দাগিরি তোমাকে মানায় না, দাদা। বাংলাদেশে গিয়ে বাউল হয়ে যাও।'

'হতে বোধহয় খারাপ লাগবে না। দেখি, সুযোগ পেলে চেষ্টা করে দেখবো। শুরু কর।' লম্বা একটা ডাল দিয়ে খুঁচিয়ে আগুন উস্কে দিতে লাগলো রেজা। আরও কয়েকটা শুকনো লাকড়ি ফেললো।

গান শুরু করলো সুজা, তার নিজের লেখা নিজের সুর করা গান: 'আকাশ ভরা তারার মেলা, দখিনা হাওয়া বয়; আমরা দু'জন পাশাপাশি, ঝিঁঝিরা কথা কয়...'

সুরেলা গলা।

গানটা শেষ করলো সে। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। ঝিরঝিরে বাতাসের সাথে যেন মিশে রয়েছে সুরের রেশ, অন্তর দিয়ে অনুভব করছে ওরা।

রাত বাড়লো। কতগুলো পাথর কুড়িয়ে এনে কুণ্ডের চারপাশ ঘিরে দিলো দু'জনে, যাতে আগুন ছড়াতে না পারে, ছড়ালে দাবানল লাগার ভয়। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা, শেষ রাতে হিম পড়তেই না শুরু করে আবার। স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকলো ওরা।

চাঁদ উঠেছে। দূরে কয়োট ডাকলো। নিঃশব্দে উড়ে এলো একটা কালো ছায়া, বসলো গিয়ে গাছের ডালে। তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়লো

'হুউপ ! হুউপ !' ইঁদুর আর খরগোশের যম, ঈগল-পেঁচা।

'এই সুজা, ঘুমিয়েছিস ?' বড় করে হাই তুললো রেজা।

সুজা জবাব দেয়ার আগেই আবার নড়ে উঠলো ঝোপ, বেশ জোরে, হরিণটা যেখান দিয়ে বেরিয়েছিলো। বেরিয়ে এলো একটা লম্বা কালো মূর্তি। চোখের পলকে চারপাশ থেকে উদয় হলো আরও চারটে। দ্রুত চলে এলো আগুনের ধারে। ঘিরে দাঁড়ালো দুই ভাইকে। গায়ে গাঢ় রঙের শার্ট, পরনে জিনস। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মোটা ডাল, মুগুরের মতো করে ধরেছে। স্কি মাস্ক দিয়ে মুখ ঢাকা।

'ওঠো,' আদেশ দিলো একটা কঠিন কণ্ঠ, সিরিশ কাগজে ঘষা যেন গলা, কথায় পশ্চিমা টান।

সুজার নাড়ির গতি বেড়ে গেছে।

চারপাশ থেকে ঘিরে ধীরে এগোচ্ছে লোকগুলো, মাথার ওপর তুলে ধরেছে ডাল, বাড়ি মারার ভঙ্গিতে।

অসহায় বোধ করলো দুই ভাই। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে চিত হয়ে আছে ওরা। হঠাৎ কিছু করতে পারবে না।

'কি চান ?' জিজ্ঞেস করলো সুজা। বেরিয়ে এলো ব্যাগ থেকে।

'চুপ ! কথা যা বলার আমরা বলবো,' ধমক দিলো আরেকটা কণ্ঠ. রেজার মনে হলো কেমন টং টং করে কথা বলে, যেন ধনুকের টংকার। 'ওঠো !'

গাড়িটা খারাপ হওয়ার পর থেকেই যেন খুব দ্রুত ঘটছে ঘটনা। ভালুকের জন্যে তৈরি ছিলো রেজা আর সুজা, মুগুর হাতে মানুষ নয়। আস্তে উঠে দাঁড়ালো দু'জনে। লোকগুলো কি চায় ? এরকম

যাও এখান থেকে

কিছু ঘটারই আশঙ্কা করেছিল ডিন মার্ট ? ওদেরকে পার্কে থাকতে নিষেধ করেছিল এ-জন্যেই ?

'হ্যাঁ, এখন বলো,' প্রথম লোকটা বললো, 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে, না বাঁকা করতে হবে ?' শক্ত করে আঁটা বেল্টের ওপর দিয়ে উপচে পড়তে চাইছে তার বিশাল ভুঁড়ি।

'সোজাটাই তো সহজ মনে হচ্ছে আমার,' জবাব দিলো রেজা।

'আঙুল সোজা রেখে যদি ঘি আটকাতে পারেন,' ঠোঁটের এক কোণ বাঁকিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গি করলো সুজা, 'আমাদের আপত্তি কি ?'

লাফ দিয়ে এসে এক ধাক্কায় সুজাকে মাটিতে ফেলে দিলো একজন। বুকের ওপর চেপে বসতে গেল। নড়ে উঠলো রেজা।

'উঁহু !' তাড়াতাড়ি বাধা দিলো ভুঁড়িওয়ালা। সঙ্গীকে বললো, 'এই, ছেড়ে দাও ওকে।' আবার ফিরলো রেজার দিকে। 'অ্যাক্সব্রেড থেকে চলে যাও। আর কখনও আসবে না।' লাথি মেরে একটা পাথর আগুনের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো সে। 'যাও। এখুনি।'

আবার উঠে দাঁড়ালো সুজা। কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, 'কেন, যাবো কেন ? এখানে কি হয়েছে ?'

'সেটা তোমাকে বলার প্রয়োজন মনে করি না,' বলে উঠলো তৃতীয় আরেকজন। পুরনো হতে হতে তার প্যান্টের নিচের দিকটায়, বুটের ঠিক ওপরে ছিঁড়ে গেছে। 'যেতে বলা হচ্ছে, যাও।'

'কারণ না বললে এক চুলও নড়ছি না আমি,' হাত নাড়লো সুজা। 'এটা সরকারি জায়গা, কারো বাপের সম্পত্তি নয়।'

'তাই নাকি, খোকা ?' খিকখিক করে হাসলো সিরিশে-ঘষা-কণ্ঠ। দুলে উঠলো বিরাট ভুঁড়ি। 'তাহলে তো জানাতেই হয়।' সঙ্গীদের

নির্দেশ দিলো, 'এই, জানিয়ে দাও।'

একসঙ্গে বাড়ি শুরু করলো পাঁচজনে। দু'হাত তুলে ঠেকানোর ব্যর্থচেষ্টা করলো দুই ভাই। কিন্তু শত্রুরা দলে ভারি, হাতে অস্ত্র। হাত তুলে, মাথা নুইয়ে, পিঠ বাঁকিয়ে, অনেক ভাবে বাড়ি বাঁচানোর চেষ্টা করছে দু'জনে, পারছে না।

মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালো সুজা। খপ করে ধরে ফেললো সামনের লোকটার হাতের ডাল, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়েই বসিয়ে দিলো এক ঘা। একই সাথে পা চালালো লোকটার হাঁটু সই করে। বাড়ি খেয়ে সামনে ঝুঁকেছিলো লোকটা, লাথি লেগে একটা পা সরে যেতেই ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে।

আরেকজনকে সই করে বাড়ি তুললো সুজা। সময় পেলো না। বাড়ি পড়লো কাঁধে। 'উফ্,' করে উঠলো, ডাল ছেড়ে দিলো। হাত উঠে এলো আহত জায়গায়। টলে উঠলো সে। প্রচণ্ড আরেক বাড়ি পড়লো কাঁধে। তারপর মাথায়। আর সহ্য করতে পারলো না। চোখের সামনে দুলে উঠলো সব কিছু। গুড়িয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল সুজা।

জ্ঞান হারানোর আগে দেখতে পেলো, লাঠি নিয়ে প্রাণপণে পাঁচ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে তার দাদা। মারার চেয়ে মার খাচ্ছে বেশি।

দুই

সুজার হুঁশ ফিরলো। তার পরেও মিনিটখানেক চুপ করে একভাবে পড়ে রইলো। মনে পড়লো, বনের ভেতর ক্যাম্পের আগুন···পাঁচ-জন মুখোশপরা লোক মুগুর দিয়ে পিটছে ওদের···

'দাদা!' উঠে বসলো সুজা। 'দাদা, কোথায়···

'এই যে,' শান্তকণ্ঠে জবাব এলো, 'আমি ভালো আছি।'

মাথার পেছনে দপদপ করছে। কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো সুজা। 'দাদা, কেন মারলো?'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো রেজা। উঠে দাঁড়ালো সে-ও, পা কাঁপছে। সারা শরীরে ব্যথা।

চারপাশে তাকিয়ে অবাক হলো দু'জনেই। কোথায় বন? তাদের ক্যাম্প নেই, আগুন নেই, মালপত্র কিছুই নেই। গাছ-পালাও নেই। পার্ক থেকে বের করে এনে ফোর-লেন একটা পথের ধারে মাটিতে ফেলে যাওয়া হয়েছে ওদের।

'কি করবো এখন?' মাথার ভেতরে কেমন ঘোলা হয়ে আছে

সুজার, খাড়া রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

'হাঁটবো, আর কী?'

হাঁটতে শুরু করলো দু'জনে। কথা শুনতে চাইছে না যেন পা। কতো আর শুনবে? বিকেলে হেঁটেছে নয় মাইল। তার ওপর প্রচণ্ড মার···আধ মাইল হেঁটেই হাঁপিয়ে গেল ওরা। চোখে পড়লো একটা তীর চিহ্ন।

'উহুহু', ভুল করে ফেললাম!' রেজা বললো। 'উল্টো দিকে চলে এসেছি। অ্যাক্সরেড আমাদের দশ মাইল পেছনে।'

'এহ্, এখানেও লিখেছে: তিনশো জন বন্ধুর শহরে স্বাগতম!' তিক্ত কণ্ঠে বললো সুজা। 'বন্ধু না কচু!'

কিন্তু শহরে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরলো দু'জনে।

রাতের বাতাস ঠাণ্ডা। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একা চৌরাস্তার মোড়ে চলে এলো ওরা, ফোর-লেন হাইওয়েকে আড়াআড়ি কেটেছে আরেকটা টু-ওয়ে লেন। তীরচিহ্ন রয়েছে এখানেও। জানা গেল, অ্যাক্সরেড ছয় মাইল দক্ষিণে।

'শব্দ কিসের?' চলতে চলতে আনমনে বললো রেজা।

দূরে চাপা গুমগুম। বাড়ছে। শেষে এতো জোরালো হয়ে উঠলো, মাটি কাঁপতে থাকলো পায়ের তলায়। স্থির হয়ে গেল দুই ভাই। চোখে পড়লো উজ্জ্বল হেডলাইট। পাহাড়ের মোড় ঘুরে দ্রুত ছুটে আসছে এদিকে। বাড়ছে এঞ্জিনের আওয়াজ।

পথের পাশে আছে শুকনো ঝোপঝাড়। কি জানি কি মনে হলো রেজার, এক টানে সুজাকে নিয়ে এসে ঢুকলো একটা ঝোপের

ভেতরে। কয়েক হাত নিচ থেকে শুরু হয়েছে ছড়ানো তৃণভূমি।

এগিয়ে আসছে গাড়ির মিছিল। বিশাল পাঁচটা ট্যাংকার, যেন গাড়ির দৈত্য একেকটা। চকচকে রূপালি গা।

'দূর, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমাদের,' ট্যাংকারগুলোর দিকে চেয়ে বললো রেজা। 'ঝোপে ঢুকলাম কেন?'

'আমি কি জানি।' হঠাৎ উঠে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথের ধারে ছুটে গেল সুজা। পথে উঠে দু'হাত মাথার ওপর তুলে নাড়তে শুরু করলো। গাড়িগুলোকে থামানোর চেষ্টায়। এঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'এই, এই, আমাদের নিয়ে যান!'

থামলো না একটা গাড়িও, এমনকি গতিও কমালো না। নব্বই মাইল গতিতে ছুটে আসছে। লাফ দিয়ে সরে গেল সুজা। পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে চলে গেল পাঁচটা ট্যাংকার, সুজার মনে হলো বাতাসের ঝাপটায়ই উল্টে পড়ে যাবে।

হেঁটে অ্যাক্সরেডে পৌঁছতে পৌঁছতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। মোটেলের নিয়ন সাইন আর শেরিফের অফিসের আলো ছাড়া গোটা শহর অন্ধকার। তবে, আরও এক জায়গায় আলো দেখা গেল, ডিন মার্টের গ্যারেজে। সেদিকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলো ওরা।

'আরি, সর্বনাশ, কি হয়েছে তোমাদের?' আঁতকে উঠলো ডিন মার্ট। ডাক শুনে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে রেঞ্চ, বোধহয় কাজ করছিলো। পায়ে পায়ে এসেছে কুকুরটা।

'সেটা আপনিই তো বলবেন আমাদের,' গম্ভীর হয়ে আছে সুজা। 'খুব ভালো জানা আছে আপনার।'

'এতো রাতে কি করছেন ?' বলে উঠলো রেজা। 'শহরের সবাই তো ঘুমিয়ে। আপনার কি এতোই কাজ ?'

বদলে গেল ডিনের মুখের ভাব, হাসি দূর হয়ে গেল। 'ঘুম আসছে না,' বলে, কারও দিকে না তাকিয়ে কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেল গ্যারেজের ভেতরে।

পেছনে গেল সুজা আর রেজা, যদিও ডাকা হয়নি ওদেরকে। ভেতরে শাদা একটা মাসট্যাঙ, হুড তোলা, এঞ্জিনের তেল বদলানো হচ্ছে।

'কিছু কথা আছে,' সুজা বললো।

'কি কথা ?' আঙুলের আঙটিটা ঘোরাচ্ছে ডিন।

'অনেক কথা। বনের মধ্যে হঠাৎ উদয় হলো পাঁচজন লোক, যথেচ্ছা মুগুরের প্র্যাকটিস করলো আমাদের ওপর।'

'আর আপনার জানা ছিলো, এটা করবে ওরা,' রেজা বললো, 'তাই না ? আপনি আমাদের পার্কে থাকতে নিষেধ করেছিলেন। কি করে জানলেন গোলমাল হবে? ওদের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? কারা ওরা ? আমাদের বের করে দিতে চাইছে কেন ?'

রেঞ্চ দিয়ে একটা নাট খুলতে লাগলো ডিন। 'এরকম প্রশ্ন করছো কেন ? গোয়েন্দা নাকি ?' বিকেলে রেজাকে আপনি আপনি করছিলো, সেকথা যেন ভুলেই গেছে মেকানিক। কিংবা হঠাৎ করে আন্তরিক হতে চাইছে।

'তা বলতে পারেন,' সুজা বললো। 'কোনো কেস হাতে নিলে রহস্যের কিনারা না করে আমরা ছাড়ি না। আর এটা তো একেবারে আমাদের গায়ের ওপর এসে পড়েছে।'

'অনেক মার মেরেছে তোমাদের, সরি,' বললো ডিন। 'বিকেলেও হুঁশিয়ার করেছি, আবার বলছি, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এর পরের শহরে। ভ্যানটা টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারবো।'

'কেন যাবো?' ভুরু নাচালো রেজা।

'দেখো, প্রশ্ন করো না,' ওদের দিকে পেছন করে আবার কাজ করতে লাগলো ডিন। 'টয়লেট আছে। ইচ্ছে করলে হাতমুখ ধুয়ে নিতে পারো।'

'লাগবে না। শেরিফের কাছে যাচ্ছি, রিপোর্ট লেখাতে।'

পেছন ফিরে থেকেই মাথা নাড়লো ডিন। 'আরেকটা ভুল করবে।'

'মানে?'

'বলছো, তোমরা গোয়েন্দা, তোমরাই বোঝার চেষ্টা করো।' নাট খুলে একটা চাকা খুলে আনলো ডিন। গড়িয়ে দিলো এক-দিকে। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো চাকাটা। উঠে গিয়ে এক এক করে আলো নেভাতে শুরু করলো সে। 'গ্যারেজ বন্ধ করবো।'

'তা তো করবেনই,' ব্যঙ্গ ঝরলো সুজার কণ্ঠে। 'সময় বুঝেছেন ভালো।'

'এসো,' শান্তকণ্ঠে ভাইকে ডাকলো রেজা, 'যাই।'

'হ্যাঁ, সে-ই ভালো,' খুশি মনে হলো ডিনকে। 'চলেই যাও।'

জবাব দিলো না ওরা। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে পথে এসে উঠ-লো।

খানিক পরে ঢুকলো শেরিফের অফিসে। ঘরে উজ্জ্বল আলো। পুরনো একটা ধাতব ডেস্ক, আর সুইভেল চেয়ার। ঘরের কোণে

টেবিলে রাখা ছোট একটা পুলিশ-রেডিওতে বাজছে লোকসঙ্গীত। ডেস্কে মোজাপরা পা তুলে দিয়ে দরজার দিকে পিঠ করে আধশোয়া হয়ে আছে একজন লোক, পরনে পুলিশ অফিসারের ধূসর ইউনিফর্ম।

সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকালো। ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে ছেলেদের মুখোমুখি হলো। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাতের পেপারব্যাক বইটা উল্টে রাখলো কোলের ওপর, লুই লামুরের লেখা একটা ওয়েস্টার্ন উপন্যাস। মাথার চুল সব ধূসর, গোঁফের কিছু কিছু কালো রয়েছে এখনও। নাকে রিডিং গ্লাস।

চশমার ওপর দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকালো অফিসার। 'কি চাই?'

'আমি রেজা মুরাদ। ও আমার ভাই সুজা। শেরিফকে দরকার।'

'তার দিকেই তাকিয়ে আছো। শেরিফ জন মরিস। তা, কি দরকার? ডিন মার্টের গ্যারেজে তোমাদের ভ্যানই তাহলে দিয়ে এসেছো। ভালো,' দুই ভাইয়ের ওপর দৃষ্টি ঘুরছে শেরিফের, মাথা নড়ছে না।

'হ্যাঁ। শেরিফ, একটা রিপোর্ট করতে এসেছি। ন্যাশনাল পার্কে থাকতে গিয়েছিলাম। মেরে বের করে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে।'

ভুরুজোড়া কাছাকাছি হলো শেরিফের। ঠোঁটের এক কোণ বাঁকলো। 'ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড় মেলে ধরলে গুঁতোতে তো আসবেই। কখন?'

'ঘণ্টা দু'য়েক হবে,' সুজা জবাব দিলো।

'কোথায়?'

'জায়গার নাম বলতে পারবো না,' রেজা বললো। 'দেখলে চিন-

যাও এখান থেকে

বো। হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো মুখোশ পরা পাঁচজন লোক। অ্যাক্সরেড থেকে আমাদেরকে চলে যেতে বললো। আমরা রাজি না হওয়ায় ধরে পেটাতে আরম্ভ করলো।'

'চেহারা দেখোনি তাহলে?' আগ্রহী মনে হলো শেরিফকে। শার্টের একটা বোতাম আনমনে ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, 'দেখতে কেমন?'

'মুখে মুখোশ থাকলে চেহারা কেমন, কি করে বলবো?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো সুজার কণ্ঠ। মুখে রক্ত জমছে, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এটা তার স্বভাব। সামান্য কারণেই মেজাজের পরিবর্তন ঘটে।

'ও-কে, ও-কে, খোকা, শান্ত হও। র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে নার্ভাস দেখি তুমি। কিছু চুরিটুরি গেছে?'

'টাকা যায়নি, তবে মালপত্রের কি হয়েছে জানি না। পিটিয়ে বেহুঁশ করে এনে পথের ধারে আমাদের ফেলে গেছে।'

'আহ্হা, তাই নাকি?'

'রিপোর্ট লিখবেন না?' ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো রেজা।

হাসলো শেরিফ। 'লেখার মতো কিছু বলতে পারোনি। নাম জানো না, চেহারা বলতে পারলে না, কোথায় ক্যাম্প করেছিলে, কিছু চুরি গেছে কিনা তা-ও বলতে পারছো না। কি লিখবো?'

'কেন, আমাদের দেখে কিছু বোঝা যায় না?' গরম হয়ে বললো সুজা। 'রক্ত দেখছেন না? কাপড়ে ময়লা? উঠে এসে দেখুন, মাথার পেছনটা এখনও ফুলে আপেল হয়ে আছে।'

'তোমরা নিজেরাই যে মারপিট করোনি, কি করে জানছি? ভাই-য়ে ভাইয়ে ওরকম লাগে। আবার মিলমিশ হয়ে যায়। ভালো যাও এখান থেকে

করেই জানি। আমারও একটা ছোট ভাই আছে।'

ডিন মার্টের কথার মানে পরিষ্কার হয়ে আসছে রেজার কাছে : আরেকটা ভুল করবে। ভাইয়ের হাত ধরে টানলো, 'চলে এসো। এখানে লাভ হবে না।'

দরজার কাছে পৌঁছে শেরিফের হুঁশিয়ারি শুনলো দু'জনে, 'থাকতে হলে ভালো হয়ে থাকবে। অ্যাক্সরেডে কোনো গোলমাল চাই না।'

রাগে জ্বলছে সুজা। বাইরে বেরিয়েই বললো, 'বাবার নাম কেন বললে না? শুনলে হয়তো কিছুটা নরম হতো।'

হাসলো রেজা। 'হতো না। ওধরনের লোকেরা সাধারণত হয় না। ও চেহারা কেমন জানতে চাইছে তো? বেশ, জানাবো। খুঁজে বের করতে হবে আরকি লোকগুলোকে। চলো, একটা ঘুমানোর জায়গা বের করি। কাল থেকে কাজ শুরু হবে।'

অ্যাক্সরেড মোটেলের কাছে এসে হাত তুলে নিয়ন সাইন আর নিচের আলোকিত দরজা দেখালো রেজা। 'ঘর খালি আছে কিনা দেখি চলো।'

'চলো।'

মোটেলের অফিসে ঢুকলো ওরা। দরজার তুলনায় এখানে আলো কম। ডেস্কের ওধারে বসে থাকা লোকটা মাঝবয়সী। চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা, ঘুম ঘুম চেহারা। পাইপ লাগিয়ে দুই লিটারের বোতল থেকে কোকাকোলা খাচ্ছে।

ডেস্কের এক কোণে ছোট একটা টেবিল ফ্যান। শব্দ করে ঘুরছে বটে, ঠাণ্ডা তো লাগছেই না, গুমোটও কাটছে না, বরং ভ্যাপসা

বাতাসকে আরও ঠেলে দিচ্ছে গায়ের ওপর।

'হয়েছে কি তোমাদের?' জিজ্ঞেস করলো ক্লার্ক।

'মারপিট করেছি। ভাইয়ে ভাইয়ে করে ওরকম, জানেনই তো,' জবাব দিলো সুজা।

'একটা ঘর চাই,' রেজা বললো। 'বাথরুমে গরম পানি আছে, এরকম।'

'বিশ ডলার অ্যাডভান্স লাগবে,' বলতে বলতে একটা মোটা রেজিস্টার খুলে ঠেলে দিতে গেল ক্লার্ক। এতেই পুরনো ডেস্কটা, ওপরটা মসৃণ নেই, খসখসে হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে ফুলে উঠেছে প্লাইউড, আটকে গেল ভারি খাতা।

দু'হাতে ধরে তুলে ওটা কাছে আনলো রেজা। পাতায় নাম-ঠিকানা লিখতে আরম্ভ করেছে, এই সময় বাজলো টেলিফোন।

প্রথম রিঙেই রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো ক্লার্ক। 'কেমন আছেন, মিস্টার হ্যারি?' খুশি খুশি কণ্ঠে বললো সে। ওপাশের কয়েকটা কথা শুনেই গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। কঠিন চোখে রেজা আর সুজার দিকে চেয়ে বার দুই 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' বললো শুধু। তারপর উঠে যন্ত্রটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কিছু বললো, যাতে ওরা শুনতে না পায়। আরও কয়েকবার 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' বলে আবার ফিরে এলো আগের জায়গায়। রিসিভার ক্রেডলে রেখে কপালের ঘাম মুছলো। নল ফেলে দিয়ে বোতলটা উপুড় করে ধরলো মুখের ওপরে। একসঙ্গে অনেকখানি পানীয় গলায় ঢেলে বুঝি শুকনো কণ্ঠ-নালী ভেজালো। তাকালো ছেলেদের দিকে। 'ভুল করেছি, ছেলেরা। ঘুমের ঘোরে উল্টোপাল্টা বলে ফেলেছি। ঘর খালি নেই।'

'কেন মিছে কথা বলছেন,' ফস করে বলে ফেললো সুজা।

ক্লার্ক জবাব দেয়ার আগেই রেজা বললো, 'আপনি যখন ওখানে গিয়েছিলেন, আপনার গেস্ট রেজিস্টার দেখেছি আমি। আজ রাতে কেউ নেই এখানে। মোটেল খালি।'

'আসবে, রাতে,' দরদর ঘামছে ক্লার্ক। জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।

ছোঁ মেরে একটা পেপারওয়েইট তুলে নিয়ে দড়াম করে টেবিলে বাড়ি মারলো সুজা। 'মিথ্যুক কোথাকার! ফোনে মানা করে দিয়েছে, না? কে করেছিলো? ওই হ্যারিটা কে?'

সুজার মেজাজের পরোয়া করলো না ক্লার্ক। আস্তে রেজিস্টার টেনে নিয়ে রেজার লেখা পাতাটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো, 'বেন-সনদের ওখানে গিয়ে দেখতে পারো। ওদের ঘর খালি থাকে।'

'তিনশো বন্ধুর শহর! হুঁহ্!' তিক্তকণ্ঠে বলে ভাইয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে মোটেল থেকে বেরিয়ে এলো রেজা।

বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস যেন আরও ঠাণ্ডা হয়ে লাগলো চোখেমুখে। শীত শীত লাগলো। দু'জনের মাথায়ই প্রশ্নের ভিড়। কি ঘটছে অ্যাক্সরেডে! কেন ওদের সঙ্গে অসহ-যোগিতা করছে সবাই? কে ফোন করেছিলো ক্লার্ককে? আর সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, এসব শয়তানির মূলে কে?

ভীষণ ক্লান্ত এখন ওরা। মাথা গরম হয়ে আছে। ভাবতে পারছে না ঠিকমতো। এখন একটা ঘর প্রয়োজন ওদের, ঘুমানোর জন্যে। বিশ্রাম দরকার।

বেনসনদের গেস্ট হাউসেও ঘর মিললো না। স্পষ্ট বোঝা গেল,

ঘর খালি আছে, কিন্তু মিথ্যে বলা হলো ওদের সঙ্গে। কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে আবার ডিনের ওখানে ফিরে এলো দু'জনে। নিজেদের ভ্যানে ঢুকে ঘুমানোর জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়লো। শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

ভাইয়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো রেজার। জেগে উঠে মনে হলো, মাত্র কয়েকটা মিনিট পেরিয়েছে। চোখ ডলতে ডলতে বললো, 'কি হয়েছে...'

'আরে দেখো না, সকাল হয়ে গেছে।'

ভ্যানের ধুলোয় ঢাকা পেছনের জানালার কাচ দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে রোদ।

'সকালটা তো ভালোই,' রেজা বললো। 'ঘুমিয়ে শরীরও ঝরঝরে হয়েছে। ঝরঝরে হলে খিদে বাড়ে, আর বাড়লে খাওয়া দরকার হয়। ঘরই পাইনি, খাবার পাবো এখানে?'

'খোঁজ করতে দোষ কি? কি জানি কেন মনে হচ্ছে, নীল গাউন পরা সুন্দরী ওয়েইট্রেস গরম গরম খাবার আর কফি নিয়ে বসে আছে আমাদের জন্যে। গেলেই টেবিলে এনে দেবে। কসম।'

'আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে দেখছি,' হাসলো রেজা। 'আবার কসম কসম শুরু করেছিস। কাল তোর ওই কসমের ঠেলায়ই বিপদে পড়লাম।'

'কসমের ঠেলায়ই আবার পার পাবে। চলো, বেরোই।' সুজাও হাসলো। ঘুমিয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে। ভ্যান থেকে বেরিয়ে রৌদ্রালোকিত পথে নামলো ওরা।

প্রথমেই পড়লো ব্রাইট সানলাইট রেস্টুরেন্ট। কিন্তু ওয়েইট্রেসরা

কেউ কথাই বললো না ওদের সঙ্গে, দূরে থাকলো খাবার দেয়া। রেস্টুরেন্টের নাম রেখেছে 'উজ্জ্বল সূর্যের আলো', কিন্তু কালো মেঘের মতো মুখ গোমড়া করে রইলো সবাই। ড্রাগস্টোরে ঢুকে রুটি কেনার চেষ্টা করলো সুজা। তাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে আরেক দিকে সরে গেল ক্লার্ক।

'ব্যাপারটা কী?' বাইরে বেরিয়ে দু'হাত তুলে প্রায় চিৎকার করে উঠলো সুজা। মেজাজ আবার খারাপ হচ্ছে। 'হারামজাদারা এরকম করছে কেন আমাদের সঙ্গে?'

'কি জানি। কোনো কারণে আমরা এখানে অবাঞ্ছিত।'

পথ ধরে হেঁটে চলেছে, এই সময় ডাক শোনা গেল, 'এই, এই ছেলেরা।' ফিরে তাকালো দু'জনে। এক বুড়ো। গায়ে ময়লা, ছেঁড়া ওয়েস্টার্ন শার্ট, বিশাল এক হ্যাট মাথায়—যেন ঘোড়ার গাড়ির চাকা। অগোছালো দাড়িগোঁফের আড়ালে ঢাকা পড়েছে মুখের অধিকাংশ।

'ওই লোক আমাদের ডাকছে।' ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো সুজা। বুড়োর দিকে চেয়ে বললো, 'আমাদের বলছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাদেরকেই,' এগিয়ে এলো বুড়ো। 'তোমাদের ভ্যানই তো দেখলাম ডিনের গ্যারেজে?...হ্যাঁ, তাহলে তোমাদেরই খুঁজছি।'

'কেন?' জানতে চাইলো রেজা।

'জলদি যাও।' জোরে জোরে হাত নাড়লো বুড়ো। 'গিয়ে দেখো, আগুন জ্বলছে। লাকড়ি বানানো হয়েছে তোমাদের ভ্যানটাকে।'

তিন

দৌড় দিলো দুই ভাই। গ্যারেজের এক ধারে পার্ক করা, তাই মোর ঘোরার আগে চোখে পড়লো না ভ্যানটা। ঘুরেই থমকে দাঁড়ালো। তাকিয়ে রইলো চোখ বড় বড় করে।

তাদের সাধের ভ্যান, বেপোর্ট পুলিস ডিপার্টমেন্টের বাতিল করে দেয়া গাড়ি নীলামে কিনে, নিজের হাতে ঘষেমেজে সাফ করে নতুন রঙ করেছে। পছন্দমতো কিছু জিনিস লাগিয়েছে ভেতরে। তার মধ্যে একটা, জাপানের তৈরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্টেরিও সিস-টেম। জ্বলছে না। যেমন রেখে গিয়েছিলো গাড়িটা, তেমনি রয়েছে।

পেছনে শোনা গেল খিকখিক হাসি। সুজার মনে হলো, গাধা গান ধরেছে। সেই বুড়ো। হাসির দমকে দুলছে ভুঁড়ি, দাড়ি কাঁপছে। 'ওহ্-হোহ্-হোহ্-হো!' টেনে টেনে হাসছে লোকটা। হাত তালি দিয়ে বললো, 'কি মজা, তাই না? হাহ্-হাহ্! কি মজা!'

'হ্যাঁ, মজাই,' সুজা বললো। হাসছে না।

যাও এখান থেকে

'যাক, বুঝতে পেরেছো, রসিকতা বোঝো। খুশি হলাম। বুড়ো হয়েছি তো, হাসির খোরাক খুব কম পাই, পেয়ে একটু মজা করলাম আরকি। স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মানুষ আমরা, স্বাধীনভাবে কাজ করবো, দোষ কি, অ্যাঁ?'

এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল রেজার ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, স্বাধীন তো নিশ্চয়। তবে অ্যাক্সব্রেডে বোধহয় স্বাধীনতা একটু বেশিই। আর বেশ মজার শহর।'

'ঠিক বলেছো। শত্রু যেমন আছে, বন্ধুও আছে। খাবার চাই? চলো, শেলির কাফেতে। চমৎকার রান্না।'

খাবারের কথায় বুড়োর প্রতি অন্যরকম হয়ে গেল সুজার মন, পলকে দূর হয়ে গেল সমস্ত রাগ, ঝাল। বললো, 'আরও একটা রেস্টুরেন্ট তাহলে আছে এ-শহরে, যেখানে খাবার মিলবে?'

'রেস্টুরেন্ট নয়, কাফে। আলাদা জায়গা। দুটোর ব্যবস্থা দু'-রকম।'

'জায়গা যা-ই হোক, আমাদের দরকার খাবার। ওরা দেবে?'

'দেবে না কেন? আমি সাথে থাকলে অবশ্যই দেবে। চেনো আমাকে?' বুকে জোরে থাবা মারলো বুড়ো।

'কি জানি,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসলো রেজা। 'যেভাবে চেহারা ঢেকে রেখেছেন।'

মাথা থেকে ঘোড়ার-গাড়ির-চাকাটা খুলে হাতে নিলে বুড়ো, যাতে তার চেহারা ভালোমতো দেখতে পারে ছেলেরা। কপাল আর মাথা দেখা গেল বটে, মুখ সেই আগের মতোই অস্পষ্ট রইলো, দাড়িগোঁফের কারণে। 'আমি উলফ রেন। বাপ নাম রেখেছিলো

উলফ, শহরের লোকে রেখেছে পেটুক। পেটুক বুড়ো বলেই ডাকে সবাই। উলফ রেন ডাকটা যে কবে শেষ শুনেছি, মনে নেই।'

'সেসব পরে মনে করলেও চলবে,' সুজা বললো। 'পেটের ভেতর গুড়গুড় করছে খিদেয়। চলুন আগে নাস্তা সারি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো।'

হাঁটতে যাবে, পেছন থেকে আবার কথা শোনা গেল, 'তোমরা এখনও এখানে?'

ডিন মার্ট। গ্যারেজ খোলার জন্যে এসেছে।

'হ্যাঁ,' সুজা বললো, 'বন্ধুত্ব করছি। তিনশো বন্ধুর শহরে শত্রুই তো দেখছি খালি। দেখি, একআধজন বন্ধু মেলে কিনা।'

চুপ করে আছে ডিন। কড়া চোখে তাকাচ্ছে বুড়োর দিকে।

'কে জানে?' হেসে বললো রেজা, 'বন্ধুত্ব পাতাতে পাতাতে ইলেকশনই করে ফেলি কিনা। শেষে মেয়রই হয়ে যাবো এই শহরের।'

ডিনকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শেলির কাফের দিকে রওনা হলো তিনজনে।

কাফের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ গতি কমিয়ে দিলো রেজা। সুজার কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বললো, 'পেছনে তাকাসনে। পিছু নিয়েছে আমাদের। জিনস, নীল শার্ট, চামড়ার ভেস্ট, সানগ্লাস —পাইলটরা যেরকম পরে।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা।

দরজা ঠেলে কাফের ভেতরে ঢুকলো সে। ভিড়, কোলাহল। গরম খাবারের লোভনীয় গন্ধ। আবার পেট মোচড় দিলো তার।

'এসো, সবচে ভালো টেবিলটা দেখাচ্ছি,' উলফ বললো। সামনের দিকে একটা জানালার পাশে বসানো টেবিলের দিকে ঠেলে নিয়ে চললো দুই অতিথিকে।

ধোয়া পরিষ্কার টেবিলক্লথ। অন্য টেবিলগুলোতে যে রঙের যে-রকম জিনিস একই রকম এটাতেও। লুক্কা বললো, 'কই, আলাদা কোথায়? একই রকম তো'

মুখে কিছু বললো না উলফ। কপালে টোকা দিয়ে কি বোঝাতে চাইলো, সে-ই জানে

টেবিলের তিনটে চেয়ারে বসলো তিনজনে।

ঘরে ঢুকলো লম্বা এক লোক। গায়ে নীল শার্টের ওপরে চামড়ার ভেস্ট পরনে জিনসের আঁটো প্যান্ট, চোখে সানগ্লাস—কাচের বাইরের দিকটা আয়নার মতো, ফলে চোখ দেখা যায় না। ওদের পাশের টেবিলটায় বসলো

'ওই যে, শেলি আসছে,' ইঙ্গিতে দেখালো উলফ। 'যতো খুশি খাবারের অর্ডার দিও। খরচা আমার'

এগিয়ে এলো মহিলা, বয়েস পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ, ঠিক অনুমান করা যায় না। বড় বড় নীল চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লোকের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নেয়ার যেন ক্ষমতা আছে। দেখেই মানুষ চিনতে পারে বোধহয়। সোনালি চুল, পেছন দিকে আঁচড়ে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। সামনের কয়েকটা বাঁকা চুলকে বাগ মানাতে পারেনি, বেয়াড়া ভাবে এসে পড়েছে মুখের ওপর। টেবিলক্লথের মতো একই কাপড়ে তৈরি গায়ের অ্যাপ্রনটাও।

'রেন, আবার ঢুকেছো,' কাছে এসেই বলে উঠলো শেলি। কথায়

পশ্চিমা টান নেই। বরং মনে হয়, পুবে মানুষ হয়েছে। রেজার দিকে চেয়ে বললো, 'খাবারের টাকা ও দেবে বলেনি ?'

রেজা আর সুজা দু'জনেই মাথা ঝাঁকালো।

'সেটা আমাদের ব্যাপার,' মিনমিন করে বললো পেটুক বুড়ো, আরেক দিকে চেয়ে, শেলির দিকে তাকাতে পারছে না, 'তোমার কি ?'

তার কথায় কান দিলো না শেলি। দুই ভাইকে জানালো, 'ও সবাইকে ওকথা বলে। পকেটে এক কানাকড়িও নেই। নতুন কাউকে পেলেই ধরে নিয়ে আসে এখানে। অর্ডার দেয়। খেয়েদেয়ে বলে মানিব্যাগ হারিয়ে গেছে, কিংবা ফেলে এসেছি···সকালে সকালে দু'বার খেয়ে গেল, আবার এসেছে···এই, ওঠো, যাও। লাঞ্চের আগে যেন না দেখি। আর সঙ্গে টাকা নিয়ে আসবে।'

'একজন বুড়োমানুষের নামে বানিয়ে কথা বলো,' বিড়বিড় করলো উলফ, 'পাপ হবে তোমার, দেখো, বলে দিলাম···'

'যখন হয় হবে, যাও,' বললো শেলি। রেজার মনে হলো, কষ্টে হাসি চাপলো মহিলা।

আর কিছু বললো না বুড়ো। টেবিল থেকে তার মস্ত হ্যাট তুলে মাথায় চাপিয়ে বাধ্য ছেলের মতো রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

'আমাদেরও যেতে বলবেন না তো ?' রেজা বললো।

'কেন ?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলো দুই ভাই। এই শহরে অবশেষে সত্যি কি একজন বন্ধু পাওয়া গেল ?

'আমরা কে জানেন না ?' জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'আমি কাফে চালাই, রাঁধুনি, মাইও রিডার নই,' হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো মহিলা। 'শেলি গার্ডনার।'

'রেজা মুরাদ। ও আমার ছোট ভাই, সুজা।'

'পরিচয় তো হয়ে গেল,' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো সুজা। 'মেনুর কথা হয়ে যাক এবার।'

'এই যে মেনু, নাও···তুমি করেই বললাম, কিছু মনে করোনি নিশ্চয়। বয়েসে অনেক ছোট হবে। হ্যাঁ, তোমরা ঠিক করো, আমি ওই টেবিলের অর্ডার নিই।' ওখানে দাঁড়িয়েই ফিরে চেয়ে পাশের টেবিলের সানগ্লাস পরা লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো শেলি, 'কি খাবে, টম ডেনভার?'

'শুধু কফি,' খসখসে কণ্ঠস্বর।

'আমি কফি নিয়ে আসি। তোমরা কি খাবে, ঠিক করো,' দুই ভাইকে বলে রান্নাঘরের দিকে চললো শেলি।

মিনিটখানেক পর ইরা বড় দুই গেলাস কমলার রস এনে রেজা আর সুজার সামনে ঠক করে রাখলো বছর বারো বয়েসের একটা ছেলে। কালো চুল, কালো চোখ। পরনে ওয়েস্টার্ন কায়দায় তৈরি জিনসের প্যান্ট, পায়ে শাদা চামড়ার গোড়ালি-ঢাকা স্নিকার, কব্জিতে কালো চামড়ার রিস্টব্যাণ্ড, তাতে রূপার ছোট ছোট বোতামের মতো লাগানো।

'কি হয়েছে আপনাদের?' কোনো ভূমিকা করলো না ছেলেটা। 'মা বললো, খিদেয় নাকি মরে যাচ্ছেন। আমার নাম নিকু, ভিয়েতনামি নাম।' হাসলো সে, লম্বা দম নিয়ে গড়গড় করে বলে গেল, 'শেলি গার্ডনারআমার আপন মা নয়, সৎ-মা। তবে মিস্টার গার্ড-

নার, রবার্ট গার্ডনার আমার বাবা ছিলো, মারা গেছে। আপনা-রাই বোধহয় নীল ভ্যানটা নিয়ে এসেছেন, ডিন মার্টের গ্যারেজে যেটা দেখলাম?' জবাবের অপেক্ষা করলো না। 'রেপোর্ট থেকে এসেছেন, পুব অঞ্চল, গাড়ির বাম্পারে হাই স্কুলের স্টিকার দেখেই বুঝেছি। কখনও যাইনি ওখানে। আসলে কোনোখানেই যাইনি, ভিয়েতনামের কিছু জায়গা আর অ্যাম্বরেড ছাড়া। জায়গাগুলো আমার পছন্দ হয়নি। দুনিয়ায় আরও কতো ভালো জায়গা আছে যাওয়ার, শুনেছি। আপনারা ক্যাম্পিঙে বেরিয়েছেন, না? গাড়িতে অনেক জিনিস দেখলাম। আরিব্বাবা, কতো জিনিস। শুধু খাবার নেই, না? অবশ্য রাখার কথা ভাববেও না কেউ। পথে একটু পরে পরে শহর, খাবারের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয় ভেবেছেন, একটা হাইওয়ে ধরে চলে যাবেন। পথে যতগুলো ক্যাম্পিঙের জায়গা পড়বে, সবগুলোতে থেমে রাত কাটাবেন। তাই না?'

'সবই তোমার জানা, না নিকু?' হেসে বললো রেজা। 'এ-শহরে কারো কোনো তথ্য জানার থাকলে তোমাকেই দরকার। হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছো, ক্যাম্পিঙেই বেরিয়েছি। কাল রাতে এখান-কার ন্যাশনাল পার্কে...'

'...গিয়ে পিটুনি খেয়েছেন,' বাক্যটা শেষ করে দিলো নিকু। 'জানি। সারা শহরই জানে এ-খবর। সবাই বলাবলি করছে।'

'আমার সামনে এসে খালি বলুক না কোনো হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত চাপলো সুজা।

'আরে আরে, রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি কিছু ভেবে বলিনি। আর লোকেরই বা দোষ কি বলুন? কে ভয় পায় না? সারাক্ষণ

ভয়ে ভয়ে থাকে, ট্রাকগুলো যখন যায়।'

'ট্রাক? কিসের ট্রাক?'

'ট্যাংকার।'

'রূপালি রঙের? কাল রাতে দেখেছি।'

রেজা, সুজা, দু'জনেই বুঝলো, আরও অনেক খবর রয়েছে নিকুর কাছে। কিন্তু শোনা হলো না। বাধা এলো পাশের টেবিলের সান-গ্লাসের তরফ থেকে। 'এই, কি বকবক শুরু করেছো এখানে? ওখানে তোমার মা রান্নাঘরে পারছে একা? জলদি যাও, সাহায্য করোগে।'

'আরে, এ-তো মাহামুসিবত। আমার মা কি করছে না করছে...,' বললো বটে, তবে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না বোধহয়, তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলো রান্নাঘরের দিকে।

পাশের একটা চেয়ারে পা তুলে দিলো টম ডেনভার।

বিরাট ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে এলো শেলি। বড় এক মগ গরম কফি নামিয়ে দিলো টমের টেবিলে। ট্রে-টা এনে রাখলো রেজাদের টেবিলে।

'আরে, এতো সব নিয়ে এলেন!' চোখ কপালে তুললো সুজা। 'অর্ডারই তো দিলাম না আমরা। তখন যে বললেন মাইও রিডার নন?'

'নাহ্, এখনও বলছি, নই,' হাসছে মহিলা। 'ভাবলাম, এগুলোই নিয়ে আসি, আজকের সব চেয়ে ভালো রান্না...কখন অর্ডার দেবে, কখন আবার রেডি করবো, তারচে...'

'খুব ভালো করেছেন।'

'আর কিছু লাগবে ?'

'লাগবে। কয়েকটা তথ্য,' আড়চোখে টমের দিকে তাকালো রেজা। 'কয়েকটা ট্যাংকারের কথা বলেছে নিকু। আমরাও দেখেছি কাল রাতে। কি নেয় ওগুলোতে করে ?'

'বিষাক্ত বর্জ্য,' শেলি বললো। 'ডভ্‌সভিলের কাছের কয়েকটা বড় বড় কারখানা থেকে রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ নিয়ে আসে।'

'বিষাক্ত বর্জ্য ?' সুজা ধরলো কথাটা। 'সে-তো ভয়ংকর জিনিস, মারাত্মক ! ও, এজন্যেই ট্যাংকারগুলো যাওয়ার সময় লোকে ভয় পায়।'

'রোজ আসে না অবশ্য,' ওদের টেবিলের কাছ থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছে শেলি, বোঝা গেল।

'তবে প্রতি মাসে আসে, নিয়মিত,' অন্য টেবিল থেকে কয়েকটা এঁটো বাসন তুলে নিয়ে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নিকু, খেয়াল করেনি দুই ভাই। 'যখন আসে, পর পর চার রাত। মাঝরাতের পর। আমার ওয়্যারলেসে ধরা পড়ে ওগুলোর সিগন্যাল।'

'কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলো ?' জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'সব সময় যেখানে যায়। হ্যারি ব্যানারের র‍্যাঞ্চের...' মায়ের ভ্রূকুটি দেখে থেমে গেল নিকু। দ্রুত চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

'তারমানে কারও র‍্যাঞ্চে নিয়ে গিয়ে ফেলছে ওসব বিষ ?' জানতে চাইলো সুজা। মাঝপথে থেমে গেছে তার কাঁটাচামচ, একটা আলুর টুকরো গেঁথে রয়েছে কাঁটায়।

'বেআইনি কিছু করছে না,' কাছের আরেকটা শূন্য টেবিলের এঁটো প্লেট গোছাতে গোছাতে বললো শেলি। 'বিশাল এলাকা

নিয়ে হ্যারির র‍্যাঞ্চ, পার্কের এদিকটায়। পার্কের কিনারে ওর সীমানার ভেতরে ফেলা হয় ওসব বর্জ্য।'

'ন্যাশনাল পার্কের কাছে, বলেন কি!' রেজারও খাওয়া বন্ধ। ওখানেই কোথাও ক্যাম্প করেছিলো ওরা, অনুমান করলো। 'ট্রাক-গুলো আসার সময় হলে এ-কারণেই মানুষকে পিটিয়ে বের করে না তো? হ্যারি ব্যানারের কথা বলছি।'

টেবিলের কাছে এসে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললো শেলি, 'এটা পাব-লিক প্লেস। এসব প্রশ্ন করার আগে ভাবা উচিত। হ্যারি ব্যানারের পরিচয় জানো? এখানকার সব চেয়ে ক্ষমতাশালী লোক। সব চেয়ে ধনী। টাউন কাউনসিল থেকে শুরু করে যতো রকম কমিটি আছে এখানে, সবগুলোর সদস্য। এখানকার বেশির ভাগ জায়গা তার, ব্যাংকটা তার। অনেকের জায়গা বন্ধক রেখেছে ওই ব্যাংক। অ্যাক্সরেডের লোকের সহানুভূতি তার প্রতি থাকা স্বাভাবিক।'

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখানকার লোকের সত্যিই অনুভূতি আছে নাকি?'

মৃদু হাসলো শেলি, তাতে শঙ্কার ছায়া। সরে গেল সেখান থেকে।

'এই মিয়ারা,' বলে উঠলো টম, 'খেতে ঢুকেছো এখানে? না কথা বলতে? খামোকা খাবার ঠাণ্ডা করছো,' চেয়ার থেকে পা নামিয়ে পিঠ সোজা করে বসলো। মাথার পেছনে ঠেলে দিলো কাউবয় হ্যাটটা। 'রাঁধুনির অপমান।'

'জানেন না বোধহয়,' সরাসরি টমের সানগ্লাসের দিকে তাকিয়ে বললো রেজা, 'খাবার সময় ভালো কথা হজমের সহায়ক।'

'এশিয়ান গাধারাই ওরকম বলে,' বেশ জোরালো মন্তব্য করলো টম।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরের অন্য সমস্ত শব্দ। ছুরি-কাঁটা-চামচের খুটখাট, মৃদু আলোচনা, সব। সবার চোখ ঘুরে গেছে দুটো টেবিলের দিকে। নজর ঘুরছে তিনজনের ওপর।

'শুধু এশিয়ানদের দোষ কেন?' সুজা বলে ফেললো, 'গাধা সব জায়গায়ই আছে। অ্যাক্সরেডেও কমতি নেই।'

ঠেলে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো টম। 'বেশি বেয়াদব ছেলে। শিক্ষা দরকার।'

'তুমি কি শেখাবে, ভাঁড় কোথাকার?' সুজার রাগ চরমে উঠলো। 'নিজেকে খুব চালাক মনে করো। ভেবেছো, ডিন মার্টের গ্যারেজ থেকে যে পিছু নিয়েছো, কিছুই খেয়াল করিনি?'

কথাটায় টম মনে মনে চমকালো কিনা, বোঝা গেল না। টেবিলের কাছে এসে বললো, 'এখানে মরিচ খুব বেশি খাই আমরা।' কাচের পেপার শেকারটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে ক্যাপ খুললো, উপুড় করে ঢেলে দিলো সুজার ডিমের প্লেটে। 'বাহ্, সুন্দর হয়েছে। নাও, খাও এবার।'

'এতো মরিচ খাওয়া যায় নাকি?' রেগেছে, সেটা বুঝতে দিলো না রেজা। 'ডিমই তো দেখা যায় না।'

'আমি বলছি খেতে!' গর্জে উঠলো টম।

মুঠো হয়ে যাচ্ছে সুজার আঙুল। উঠে দাঁড়াতে গেল রেজা। কিন্তু তার আগেই লাথি মেরে নিচ থেকে চেয়ার সরিয়ে দিলো টম। দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল রেজা। মাথার পেছনটা

জোরে ঠুকে গেল মেঝেতে, ঘুরে উঠলো মাথা। লোকের শিস আর হাসির শব্দগুলো মনে হলো বহুদূর থেকে এসে কানে বাজছে।

'হাআরামজাদা! কাউবয়ের বাচ্চা!' ভীষণ রাগে চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। উঠে ঘুসি মারতে গেল টমের চোয়ালে।

আশেপাশে কোথাও তীক্ষ্ণ শপাং করে উঠলো পুরনো ফ্যাশনের ওয়েস্টার্ন ল্যাসো। সুজার ঘুসি লক্ষ্যস্থলে লাগার আগেই লম্বা দড়ির ফাঁস এসে মাথা গলে নেমে গেল তার বুকে-পিঠে, আটকে ফেললো দুই হাত। পরক্ষণেই পেছন দিকে হ্যাঁচকা টান। কিছুই করার সুযোগ পেল না সে। অসহায় ভাবে চিত হয়ে পড়লো মেঝেতে।

চার

হাত নাড়তে পারছে না বটে সুজা, কিন্তু পা মুক্ত রয়েছে। পিঠ বাঁকা করে ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো, পারলো না। টানাটানিতে আরও শক্ত হয়ে আটকে যাচ্ছে ফাঁস। ব্যথা পাচ্ছে। ধাক্কা লেগে কাত হয়ে গেল টেবিলটা, খাবার ছড়িয়ে পড়লো, কিছু লাগলো টমের কাপড়ে।

'বিচ্ছু কোথাকার!' চিৎকার করে উঠলো টম। 'শয়তান!'

'ধরো ব্যাটাদের, টম,' ভিড়ের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলো কে যেন। 'আচ্ছা করে ধোলাই দাও।'

গর্জন আর হাসির একটা অদ্ভুত মিশ্র শব্দ বেরোলো টমের গলা থেকে। এগিয়ে এলো সুজার দিকে।

উঠে দাঁড়ালো রেজা। মাথা নিচু করে ছুটে এলো। পেটে শক্ত খুলির প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে আঁউক করে উঠলো টম, প্রায় ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেলো দেয়ালে। বিস্ময় ফুটলো তার চোখে, পড়তে পড়তেও দ্রুত সামলে নিলো। মাথা সোজা করতে পারেনি তখনও

রেজা। টমের চোখা জুতোর মাথা সজোরে এসে আঘাত হানলো তার চোয়ালে।

ব্যথায় ককিয়ে উঠলো রেজা। গিয়ে পড়লো একটা চেয়ারে, সেটা নিয়ে পড়লো মাটিতে। চেয়ারের একটা পা লাগলো আহত জায়গায়, আগের দিনের পিটুনির। গুঙিয়ে উঠলো।

'থামো! থামো বলছি!' বাতাস চিরে দিলো যেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শেলি, হাতে কয়লা খোঁচানোর একটা চোখা লোহার শিক। চেঁচিয়ে উঠলো আবার, 'এরপর যে নড়বে, তার পেটে ঢোকাবো এটা!'

থেমে গেল মারপিট। সরে শেলিকে আসার জায়গা করে দিলো জনতা।

'নীল হ্যামার, দড়ি খোলো। কুইক্!' ধমক দিয়ে বললো শেলি। 'দড়ির খেল দেখানোর এতো শখ থাকলে সার্কাসে যাও না কেন?'

ঢিল হলো দড়ির ফাঁস। উঠে দাঁড়ালো সুজা। তার পায়ের কাছে ঝুপ করে খসে পড়লো দড়ি। ফিরে দেখলো ল্যাসোধারীকে, যাকে নীল হ্যামার বলে ডেকেছে শেলি।

পোশাকে, চেহারায়, পুরোদস্তুর কাউবয়। বয়েস বিশ। কাউবয় হ্যাটের নিচে সোনালি কোঁকড়া চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে ঘাড়ের ওপর। গায়ে শাদা টি-শার্ট, পরনে জিনস, পায়ে কাউবয় বুট। বুটের তলায় রোডেও রাইডারের কাঁটা লাগানো দেখে হাসি পেলো সুজার।

'কি করবো?' শেলির দিকে চেয়ে কৈফিয়ত দিলো নীল। 'হু'-

যাও এখান থেকে

জনে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বেচারা টমের ওপর। কাজটা ঠিক করেনি।'

'পেছন থেকে কাউকে বেঁধে ফেলাটাও ঠিক কাজ নয়,' কঠিন কণ্ঠে বললো শেলি। ঝটকা দিয়ে ফিরলো টমের দিকে। হাতের পিকটা এমনভাবে তুলে ধরলো, যেন এখুনি ওর পেটে ঢোকাবে।

হেসে পরিবেশে তরল করার চেষ্টা করে বললো টম, 'হয়েছে, হয়েছে, রাখুন ওটা। বুঝতে পারছি, মেজাজ খারাপ হয়েছে। ...এমনি একটু মজা...'

'মজা!' হাত নেড়ে থামিয়ে দিলো টমকে সুজা। 'সেই সকাল থেকে আমাদের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছো, একে মজা বলো?'

'মজা কে বলছে?' দড়ি নাচালো নীল হ্যামার। 'আমরা...'

'এই, তুমি চুপ!' ধমক দিলো টম।

নীলের দিক থেকে টমের দিকে তাকালো শেলি।

চট করে পরস্পরের দিকে তাকালো রেজা আর সুজা। নীলের 'আমরা' শব্দটা কান এড়ায়নি ওদের। ওরা ভেবেছিলো, শুধু টমই ওদের পিছু নিয়েছে। লোক দু'জন ছিলো, বুঝতে পারেনি। কিন্তু কে লাগালো লোক দুটোকে? শেরিফ? ডিন মাট?

'আমি জানতে চাই, তোমাদের ঘটনাটা কি? কেন এই গণ্ডগোল?' টমের দিক থেকে আবার নীলের দিকে ফিরলো শেলি।

কিন্তু জবাব দেয়ার জন্যে দাঁড়ালো না দু'জনের একজনও। সোজা রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে অবশ্য ফিরে তাকালো টম। কোমরে ঝোলানো অদৃশ্য খাপ থেকে অদৃশ্য পিস্তল বের করে রেজা আর সুজার হৃৎপিণ্ডে গুলি

যাও এখান থেকে

করার অভিনয় করলো। হেসে উঠলো কেউ কেউ।

বেরিয়ে গেল দুই কাউবয়। যার যার টেবিলে ফিরে গেল আবার লোকেরা, রেজা-সুজার দিকে আর একবারও তাকালো না। ওরা যেন নেই এ-ঘরে।

হেসে শেলিকে ধন্যবাদ জানালো রেজা।

'শুধু ধন্যবাদে কাজ হবে না,' কড়া গলায় বললো শেলি। 'মোছো। সব সাফ করো। প্লেট গেলাসের দাম পাইপয়সা হিসেব করে বুঝে নেবো আমি।' শিকটা দিয়ে বাতাসে খোঁচা মেরে, ঘুরে গটমট করে গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে।

ভাঙা কাচ একখানে করতে করতে নিচু গলায় সুজা বললো, 'মহিলা এতো রেগেছে কেন?'

'বুঝতে পারছি না।' নষ্ট খাবারগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে রেজা।

'কাল রাতে মুখোশ পরাদের দলে ওই দুই ব্যাটাও ছিলো না তো?'

শ্রাগ করলো রেজা।

'ইচ্ছে করেই কিন্তু লাগলো এখন আমাদের সঙ্গে। কারণটা বুঝতে পেরেছো?'

'কি জানি। আসল বিষয় থেকে নজর আরেকদিকে সরানোর জন্যে অনেক সময় গোলমাল বাধায় লোকে।'

এক মুহূর্ত ভাবলো সুজা। 'শেলি বললো, হ্যারি ব্যানারের র‍্যাঙ্কে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলা হয়। একই সঙ্গে একথাও বললো: কাজটা বেআইনি নয়।'

যাও এখান থেকে

'শুনেছি।'

অনেক কথা ভাবছে রেজা। প্রথমে পার্কে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ওদের। তারপর পিটিয়েছে। বেহুঁশ করে এনে ফেলে গেছে পথের ওপর। ট্যাংকারগুলো হ্যারি ব্যানারের র‍্যাঙ্কে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে। কাকতালীয়? নাকি সমস্ত ব্যাপার ট্যাংকারের সাথে সংযুক্ত? এখানেও মারপিট শুরু হলো ট্যাংকার নিয়ে আলোচনার পর। দুটো কাকতালীয় ব্যাপার? না, তা হতে পারে না। আর কাদের লোক পেটালো ওদের? হ্যারি ব্যানারের?

'কাজ সারো,' ফিসফিসিয়ে ভাইকে বললো রেজা। 'হ্যারি ব্যানারের র‍্যাঙ্ক দেখতে যাবো।'

টেবিলটা সোজা করলো সুজা। স্টিলের বড় একটা ডিশে কাচের টুকরোগুলো তুলে নিলো। আরেক টেবিল থেকে আরেকটা এঁটো ডিশ এনে তাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারগুলো তুললো রেজা। দু'জনে দুটো ডিশ নিয়ে সুইং ডোর ঠেলে এসে ঢুকলো রান্নাঘরে।

ময়লা ফেলার একটা ড্রামে জিনিগুলো ঢাললো ওরা। তাদের দিকে একবার চেয়েই আবার রান্নায় মন দিলো অ্যাপ্রন পরা সহকারী বাবুর্চি। এই সময় শেলিও এসে ঢুকলো। আরও কয়েকজন খদ্দেরের কাছ থেকে খাবারের অর্ডার নিয়ে এসেছে। সরতে ইঙ্গিত করলো রেজা আর সুজাকে। জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা সত্যি তোমাদের পিছু নিয়েছিলো?'

'নিয়েছিলো,' জবাব দিলো সুজা।

ঘন নীল চোখের স্থির দৃষ্টি দীর্ঘ এক মুহূর্ত ঘোরাফেরা করলো দুই ভাইয়ের ওপর। সতর্ক মুরগীর মতো একপাশে মাথা কাত

করলো শেলি, 'কেন ?'

'সে-কথাটাই আমরাও জানতে চাই।'

'কিছু একটা ঘটছে এই অ্যাপ্লরেডে,' রেজা বললো। 'কী, জানি না। কিন্তু ঘটছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'এক কাজ করো তোমরা,' মুখে হাসি, কিন্তু কণ্ঠের অস্বস্তি চাপা দিতে পারলো না শেলি, 'তোমাদের গাড়ি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোথাও থেকে যাও। কোনো একটা জায়গায়। কি বলছি বুঝতে পারছো ?'

'থ্যাংকিউ। তা বোধহয় সম্ভব নয়।'

'হ্যারি ব্যানারের র‍্যাঞ্চ দেখতে যাচ্ছি আমরা,'-সুজা বললো। 'একটা গাড়ি দরকার। ভাড়াটাড়া পাবো কোথাও, জানেন ?'

'আমারটা অন্তত পাবে না, একথা বলতে পারি। শহরের সবাই জানে তোমাদের কথা। গাড়ি দিয়ে বিপদে পড়তে চাই না।'

'হ্যারি ব্যানারকে ভয় করেন নাকি ?' জিজ্ঞেস না করে পারলো না রেজা।

মুখ দেখেই বোঝা গেল, প্রশ্নটা শেলির ভালো লাগেনি। একটা প্লেটে ডিম ভাজা আর মাংসের কাবাব তুলে নিয়ে চলে গেল বসার ঘরে। আবার যখন ফিরলো, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে রেজা আর সুজা। ওদেরকে ইশারায় আসতে বলে পেছনের আরেকটা দরজার দিকে এগোলো সে। দু'জনকে নিয়ে এলো রেস্টুরেন্টের পেছনে একটা গ্যারেজে। পথের ওপর ছড়িয়ে আছে কাঠের গুঁড়ো, ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যাতে বালি উঠতে না পারে।

গ্যারেজের এক কোণে শাদা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা

হয়েছে কিছু। এগিয়ে গিয়ে একটানে চাদরটা সরালো শেলি। চাদরে জমে থাকা ধুলো উড়লো। দেখা গেল লাল একটা পুরনো হারলে-ডেভিডসন মোটর সাইকেল। 'এটা আমার স্বামীর। চালু করতে পারলে, নিয়ে যাও।'

ক্লাসিক জিনিস! চোখ চকচক করে উঠলো সুজার। হারলে-ডেভিডসন একটা স্পোর্টস্টারের মালিক হবার স্বপ্ন তার বহুদিনের। কিন্তু অনেক দাম, পাওয়াও যায় খুব কম।

রেজা অবাক। 'ম্যাডাম, বুঝতে পারছি না, আমাদেরকে কেন সাহায্য করছেন আপনি?'

'কেন করছি?' বলেই রান্নাঘরের দিকে ফিরলো শেলি। কয়েক পা গিয়ে থামলো। ঘুরে তাকালো আবার। 'রবার্টের জন্যে।' ফিরে এলো পায়ে পায়ে। মোটর সাইকেলটার কাছে গিয়ে হাত রাখলো হ্যাণ্ডেলবারে। 'স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি আমার স্বামীর। রহস্যময় হ্যারি ব্যানারের সংগে সম্পর্ক ভালো ছিলো না তার। কি নিয়ে শত্রুতা, জানি না। কখনো বলেনি আমাকে। জিজ্ঞেস করলে রসিকতা করে বলতো: সেটা আপনার জানার দরকার নেই, ম্যা'ম। খুব রসিক লোক ছিলো, হাসিখুসি। তবে মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যেতো, কেন, সে-ই জানে। হয়তো হ্যারি ব্যানারের সঙ্গে শত্রুতাই এর কারণ। মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতো তখন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একনাগাড়ে চালাতো, আর ভাবতো। মেরিল্যাণ্ডে থাকার সময়ও ওরকম করতো। ওটা তার স্বভাব। কোনো সমস্যার সমাধান করতে না পারলে মোটর সাইকেলে চড়ে বসতো, ভেবে উপায় বের করার চেষ্টা করতো।'

নীরব হয়ে রইলো শেলি। মুখে বিষণ্ণ হাসি।

'রহস্যময় ভাবে মারা গেছেন বললেন?'

'শেরিফকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য অন্য কথা বলবে। বলবে, সাধারণ দুর্ঘটনা। ন্যাশনাল পার্কের পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে মরেছে। পাহাড়ের গোড়ায় পাওয়া গেছে রবার্টের লাশ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।'

'কি হয়েছিলো তাহলে?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যারি ব্যানার!' শেলির কণ্ঠ বরফের মতো শীতল।

'কেন?'

জল টলমল করে উঠলো শেলির চোখে। এক ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো এক গাল বেয়ে। সেটা মুছে নিয়ে বললো, 'কারণ নিশ্চয় আছে। শুধু আমার স্বামীই নয়, কেরি বিংহ্যামের স্বামীও মারা গেছে রহস্যময় দুর্ঘটনায়। বিংহ্যামের সঙ্গেও ব্যানারের বনিবনা ছিলো না। কেরিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, একই কথা বলবে। আর ব্যানারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, সে বলবে আমাদের দুই বিধবার মাথায় ছিট আছে। আমরা তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে পারবো না।' থামলো এক মুহূর্ত। 'তোমাদেরকে সাহায্য করার কারণ বুঝতে পারছো? যদি কিছু করতে পারো...'

'পারবো, ম্যাডাম,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো রেজা। 'নিশ্চয় করতে পারবো।'

আর কিছু না বলে শেলি চলে গেল। মোটরসাইকেলটা নিয়ে ব্যস্ত হলো দুই ভাই। ওটাকে চালু করতে হবে। কিছুক্ষণ পর এলো নিকু। নীরবে হাঁটাহাঁটি করলো কিছুক্ষণ গ্যারেজের বাইরে,

লাথি মেরে কাঠের গুঁড়ো ওড়ালো। শেষে এগিয়ে এলো কাছে। 'ওটা আমার বাবার বাইক, জানেন নিশ্চয়।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা আর সুজা।

'আমি বড় হলে আমাকে দেবে বলেছিলো। সেজন্যেই যত্ন করি।'

'বোঝাই যাচ্ছে,' সুজা বললো। 'ব্যাটারি গায়েব, ট্যাংক খট-খটে শুকনো, বডি পরিষ্কার...'

'এভাবে রাখতে শিখিয়েছে বাবা।' বাইকটার চারপাশে এক চক্কর দিলো নিকু। দু'জনের পেছনে এসে থামলো।

'চালু করতে পারলে প্রথম সওয়ারি বানাবো তোমাকে,' রেজা বললো।

'চালু করতেই পারবেন না। বাবা ছাড়া আর কেউ পারতো না। বড় মেজাজি গাড়ি। বাবা বলতো, এটার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার না করলে কথা শোনে না।'

নিকুর বিষণ্ণতা সংক্রমিত হলো সুজার মাঝে। বুঝতে পারলো, পুরনো মোটর সাইকেল থেকেই শুধু নয়, ওটা ঝাড়তে গিয়ে ছেলে-টার স্মৃতি থেকেও বালি ঝাড়তে শুরু করেছে ওরা। বললো, 'ভদ্র ব্যবহারই করবো, নিকু, কিচ্ছু ভেবো না। সামান্যতম ব্যথা দেবো না এটাকে।'

সুজার আশ্বাসে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলো না নিকু। চলে গেল। কিন্তু খানিক পরই ফিরে এলো।

টুল বক্স থেকে একটা রেঞ্চ বের করে এনে সুজার হাতে দিলো নিকু। 'ছোট বেলা থেকেই এটায় চড়ছি। ইট্টুক বয়েস থেকে। যাও এখান থেকে

বাবা খুব মজার লোক ছিলো, মজার মজার কথা বলতো। বাইক-টার নাকি মন আছে, মন খারাপ হলেই নাকি বিগড়ে যায়। আমি বিশ্বাস করতাম না। বলতাম, আরে দূর, কারবুরেটর সাফ করো, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা বোধহয় দুঃখ পেতো, তবে সেটা বুঝতে দিতো না আমাকে। ইস্, কেন যে বলতাম! মেনে নিলেই হয়ে যেতো...' শেষ দিকে ধরে এলো ছেলেটার গলা। দ্রুত চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

মিনিট দু'য়েক পরেই আবার ফিরে এলো। নিকুর সাথে অনেক কথা বললো ওরা। ওর পরিবার সম্পর্কে, অ্যাক্সরেড সম্পর্কে অনেক কিছু জানলো। নিকু জানলো রেজা আর সুজার পরিবারের কথা, বেপোটের কথা, দুই ভাই যে গোয়েন্দা হতে চায়, সেকথা।

লাঞ্চের সময় খাবার নিয়ে এলো নিকু। খবর জানালো, 'ডিন মার্ট মার সঙ্গে কথা বলছে।'

স্যাণ্ডউইচ বের করে কামড় দিলো রেজা। চিবাতে চিবাতে বল-লো, 'শহরের সবাই জেনে গেছে আমাদের কথা। গোপনে কিছু করা কঠিন হবে। এখন যা করার করতে হবে জলদি জলদি।'

কয়েক মিনিটে খাওয়া সারলো ওরা। আবার কাজে ব্যস্ত হলো। সব কিছু ঠিকঠাক করে পেট্রোল ভরে চালানোর উপযোগী করতে করতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সিটে চড়ে বসে স্টার্টারে কিক দিলো সুজা। ভেবেছিলো, প্রথম কিকেই চালু হয়ে যাবে। তা তো হলোই না, বার বার লাথি মারতে মারতে ঘেমে নেয়ে যাওয়ার পরেও চালু হলো না এঞ্জিন। ঘুট-ঘুট-ঘুট করে পিস্টন কয়েকবার ওঠানামা করেই থেমে যায়, যেন অট্টহাসি হেসে ব্যঙ্গ করছে দুই ভাইকে।

'বলেছিলাম না?' নিকু বললো। 'বাবার কথাই ঠিক। ওটার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। নইলে কথা শুনবে না।'

'বেশ,' নিকুর দিকে চেয়ে এক চোখ টিপলো সুজা। 'দেখি ও-ভাবেই।' আস্তে করে বাইকের পেট্রোল ট্যাংকে চাপড় দিয়ে বললো, 'প্লিজ, ভাই, স্টার্ট হও।' কিক দেয়ার আগের মুহূর্তে খেয়াল করলো, চাবি অফ করে রেখেছে। স্টার্ট হবে কি করে? নিকুর অলক্ষ্যে চাবি ঘুরিয়ে অন করে দিলো। তারপর দিলো কিক। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো এঞ্জিন।

নিকুকে পেছনে বসিয়ে বাইক নিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরোলো সুজা, চালিয়ে দেখবে ঠিক মতো চলে কিনা।

চমৎকার গাড়ি। পথ থেকে মাঠে নেমে পড়লো সুজা। মনে হলো, তাজি ঘোড়ায় চেপেছে। এই ওয়েস্টার্ন অঞ্চলের সঙ্গে মানানসই।

ফিরে এলো আবার গ্যারেজে।

'রাত হয়ে গেছে,' রেজা বললো। 'এখন গিয়ে লাভ হবে না। অন্ধকারে দেখতে পাবো না কিছু। আরেক রাত পার্কে কাটানোরও ইচ্ছে নেই আমার।'

একমত হলো সুজা। শেলির কাছ থেকে কম্বল চেয়ে এনে রাতটা গ্যারেজেই কাটালো দু'জনে। ভোরে উঠে মোটর সাইকেলে চেপে রওনা হলো হ্যারি ব্যানারের র‍্যাঞ্চ দেখার জন্যে।

পশ্চিমে চললো ওরা। শহর ছাড়িয়ে চলে এলো মাইল আটেক, এখানে র‍্যাঞ্চের শুরু। শত শত একর জুড়ে। শেষ হয়েছে ন্যাশনাল পার্কের সীমানা ঘেঁষে।

'আমাদের মালগুলো খুঁজবে নাকি?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'এখন না। ব্যানার হুঁশিয়ার হয়ে যাওয়ার আগেই দেখে আসবো ভেতরে কি আছে।'

পার্কের কাছাকাছি এসে ডানে মোড় নিয়ে এঁকেবেঁকে উত্তরে চলে গেছে একটা পথ, ব্যানারের সীমানার ভেতর দিয়ে। ওই পথ ধরলো রেজা। পুব আকাশে গরম হচ্ছে সূর্য, আগুনের হলকা ছড়ানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে যেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাতিয়ে তুলবে উত্তরের ধূসর পর্বতশ্রেণীকে।

'পার্কটা বাঁয়ে,' অনুমান করার চেষ্টা করছে সুজা, 'তাহলে বর্জ্য ফেলা হয় ডানে, নিকুর কথা অনুযায়ী। আর দুটোর মাঝামাঝি কোথাও রয়েছে ব্যানারের র‍্যাঞ্চ হাউস।'

জবাব দিলো না রেজা। পথের দু'ধারে সারি সারি গাছ, ওগুলোর ভেতরে প্রাণের চিহ্ন খুঁজছে। এখানে গাছ আছে, কিন্তু ব্যানারের বেশির ভাগ জায়গাই গাছপালা শূন্য, সমভূমি। পার্কের কিনার ঘেঁষে গাছ আছে, পাইন বন। ওই জায়গাটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ে।

গাছের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরোতেই চোখে পড়লো পাথরে তৈরি একটা লম্বা বাড়ি, পথ থেকে দু'শো ফুট দূরে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিলো রেজা।

পথের ওপরই মোটর সাইকেলটা রেখে বাড়ির দিকে এগোলো দু'জনে। খোলা জায়গা দিয়ে নয়। গাছপালার আড়ালে আড়ালে। শুকনো পাতায় মর্মর তুলে বয়ে গেল এক ঝলক বাতাস। আর কোনো শব্দ নেই। আগেও যেমন ছিলো না, এখনও নেই।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গাড়িগুলো দেখতে পেলো। পিকআপ

আছে, কার-ও আছে। ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা। একটা গাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ওদের। লাল রঙের ভ্যান। পাশে এয়ারব্রাশ পেইনটিঙের সাহায্যে আঁকা ছবি। মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে একটা মাসট্যাং ঘোড়া, জ্বলন্ত চোখ, পিঠের সওয়ারি একটা মানুষের কঙ্কাল।

'দেখেছো?' রেজা বললো। 'শুধু ছবি আঁকার খরচ দিয়েই একটা গাড়ি কেনা যায়। এতো দামি গাড়ি কেনার টাকা একজন র‍্যাঙ্কার পেলো কোথায়?'

মুখ খুলতে যাবে, হঠাৎ একটা শব্দ স্থির করে দিলো সুজাকে। দুরুদুরু করে উঠলো বুক। অনেক দূরে রয়েছে এখনও আওয়াজ, কিন্তু দ্রুত ছুটে আসছে।

'কুত্তা! গার্ড ডগ!' বললো সে। 'অনেকগুলো।'

'দৌড় দাও! জলদি!'

এসেছিলো ঘুর পথে, ফিরে চললো কোণাকুণি, যতো তাড়াতাড়ি পারে মোটর সাইকেলের কাছে গিয়ে পৌছতে চায়। দু'জনেরই বুক ধড়াস ধড়াস করছে। দ্রুত কাছিয়ে আসছে রক্ত-জমাট-করা চিৎকার। ছয়-সাতটার কম না।

বাইকের কাছে আগে পৌছলো সুজা। চড়ে বসলো। চাবি অন করেই রেখে গিয়েছিল, কিক দিলো। একবার, দু'বার, তিনবার ...হলো না। 'দোহাই, দোহাই তোর, বাইক,' অনুরোধ করলো সে, 'স্টার্ট হ। প্লীজ!'

কোনো অনুরোধেই কান দিলো না বাইক।

কুকুরগুলোও এগিয়ে আসছে।

পাঁচ

'থাক ওটা !' চেঁচিয়ে উঠলো রেজা। 'গাছ ! গাছে ওঠো !'

বাইক থেকে নেমে সামনের গাছটার দিকে ছুটলো সুজা।

খাড়া উঠে গেছে গাছগুলো। গোড়া মোটা। হাত বাড়িয়ে কোনো ডালই নাগাল পাওয়া যায় না, সব চেয়ে নিচেরটাও অনেক ওপরে। বেয়ে ওঠা দুঃসাধ্য। এখন কি করবে ? আর তো কোনো জায়গা নেই যাওয়ার !

সাথে কোনো রকম অস্ত্র নেই। ভয়ংকর একদল কুকুরের বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াই করে কয়েক মিনিটও টিকবে না। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

'গাড়িগুলোর দিকেই চলো !' সুজা বললো।

আবার ফিরে যেতে সময় লাগবে। কুকুরগুলোও ওদিক থেকেই আসছে। মাঝপথেই না দেখা হয়ে যায়। কিন্তু আর কোনো উপায়-ও নেই। দেরি করলো না। সুজার পেছনে দৌড় দিলো রেজা। গাছের ভেতর দিয়ে ছুটে পৌঁছে গেল গাড়িগুলোর কাছে।

হলুদ রঙের বিশাল এক ক্যাডিলাক কনভার্টিবল-এর সামনে এসে দাঁড়ালো। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো সুজা, দিয়েই পাথর হয়ে গেল। আতঙ্ক দেখা দিলো চোখে। 'তালা দেয়া!'

'এসে পড়েছে!' ফিরে তাকিয়ে আছে রেজা। ছুটে আসছে জানোয়ারগুলো। বাদামি আর কালো রঙের জার্মান শেফার্ড, বড় জোর বিশ গজ দূরে আছে আর। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। ধুলো উড়ছে নখের আঘাতে।

লাল ভ্যানটার কাছে দৌড়ে গেল রেজা। হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিতেই খুলে গেল দরজা। অবাক হবার কিংবা স্বস্তি পাওয়ারও যেন সময় নেই। লাফিয়ে উঠে গেল ভেতরে। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'সুজাআ!'

জবাব নেই।

মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিলো রেজা। একটা জীপের দরজা খোলার চেষ্টা করছিলো বোধহয় সুজা, বন্ধ থাকায় পারেনি। এই সময় পৌঁছেছে কুকুরগুলো। বেগতিক দেখে জীপের ছাতে চড়েছে সে। নিচে থেকে লাফালাফি করছে শেফার্ডের দল, তাকে ধরার চেষ্টা করছে।

বেশিক্ষণ লাগবে না, ধরে ফেলবে। যে ভাবে চেষ্টা করছে, কিছু-ক্ষণের মধ্যেই কুকুরগুলোও ছাতে উঠে পড়বে। এখুনি কিছু একটা করা দরকার, নইলে সুজাকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু কি করবে?

একটাই উপায় আছে, এবং সেই কাজটাই করলো রেজা। ভ্যান থেকে নেমে কুকুরগুলোর উদ্দেশে চেঁচালো, 'এই শয়তানের দল, যাও এখান থেকে

এদিকে আয়। এই কুত্তা, কুত্তাআ!'

কটকা দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ফিরে তাকালো কুকুরগুলো। ভ্যানের বাইরে সহজ শিকার দেখে সোজা তেড়ে এলো।

জীপের কাছ থেকে জানোয়ারগুলো সরে যেতেই লাফ দিয়ে নেমে পড়লো সুজা। আরেক দিক দিয়ে দৌড়ে এলো ভ্যানের কাছে। কুকুরগুলোও পৌঁছে গেছে। আবার ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে রেজা। আরেক দিকের দরজা খুলে দিয়ে চিৎকার করে বললো, 'জলদি ঢোকো!'

ভ্যানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো সুজা। এতো সহজে পারতো না, পারলো, তার কারণ, কিছুক্ষণের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলো কুকুরগুলো। রেজা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই ওরা ভেবেছে, এই শিকারটা হাতছাড়া, জীপের ওপরেরটাকে ধরার চেষ্টা করাই ভালো। আবার ফিরে দোড় দিয়েছে। মাঝপথে গিয়ে বুঝেছে, ওটাও নেই। আবার ফিরে এসেছে ভ্যানের কাছে। ততোক্ষণে সুজা নিরাপদ।

ছয়টা কুকুর, একযোগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভ্যানের ওপর, দু'দিক থেকে। চেঁচিয়ে, লাফিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করলো। জানালার কাঁচে আটকে গেল ওদের থাবা, আঁচড়ের পর আঁচড় লাগছে গাড়ির রঙিন বডিতে।

'গেল গাড়ির দামি চিত্রকর্ম,' সুজা বললো।

'মালিকের কাছে মাপ চেয়ে নেবো পরে।'

কয়েক মিনিট একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে চুপ হলো কুকুরগুলো। ঢোকার অন্য উপায় খুঁজতে লাগলো। চক্কর দিতে থাকলো ভ্যান-

যাও এখান থেকে

টাকে ঘিরে। রেজা আর সুজার মুখ দেখেই ঘেউ ঘেউ করে এসে লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে।

কখন যায় ওগুলো কে জানে। চুপচাপ বসে না থেকে গাড়ির ভেতরে কি আছে দেখতে শুরু করলো দু'জনে। মেঝেতে পুরু কার্পেট। চামড়া মোড়া নরম গদিওয়ালা সিট। পেছনে বেঞ্চ-সিট সরিয়ে সে-জায়গায় বসানো হয়েছে স্যাডল-সিট, পাশাপাশি দুটো করে, দু'দিকে চারটে। ইস্পাতের খুঁটি আর ফ্রেমের ওপর, মেঝে থেকে ফুট দুই উঁচুতে। রেফ্রিজারেটর আছে, ট্র্যাক লাইটিং-এর ব্যবস্থা আছে, শক্তিশালী একটা স্টেরিও ডেকসেট আছে—স্পীকার দুটো বেশ কায়দা করে দু'দিকের দেয়ালে বসানো।

কয়েকটা ক্লেয়ার খুঁজে বের করলো রেজা। 'এগুলো দিয়ে কি করে?'

'কে জানে! দরজা খোলা, চাবিটা রেখে গেল না কেন?'

'আমরা যে পালিয়ে যাবো, জানে বোধহয়,' হেসে বললো রেজা।

'যা-ই বলো, গাড়িটা দারুণ। আমাদের এরকম একটা থাকলে হতো, সাজানো গোছানো...'

'হ্যাঁ।'

'কি মনে হয়? এটা হ্যারি ব্যানারের?'

পেছনের একটা স্যাডল-সিটে বসে পড়লো রেজা। 'হতে পারে। যারই হোক, টাকা খরচ করেছে এর পেছনে। কি খুঁজছো?'

'স্কি মাস্ক,' চোয়াল শক্ত হয়ে গেল সুজার।

'দেখো। পেলে ভালো...আরে, বাইরে এতো শান্ত কেন? কুত্তাগুলো চলে গেল?' স্যাডল থেকে নেমে এসে সামনের জানা-

লা দিয়ে বাইরে তাকালো রেজা। 'ও, না, আছে। বসে আছে। আমরা বেরোলেই ...' কথা শেষ করতে পারলো না সে। তার মুখ দেখেই ঘেউ ঘেউ করে এসে জানালার কাচে থাবা মারলো কয়েকটা কুকুর। তাড়াতাড়ি সরে এলো সে।

'চেঁচামেচি তো কম করছে না। কারও কানে যায়নি? দেখতে আসছে না কেন?'

'কি জানি,' আবার স্যাডলে বসতে বসতে বললো রেজা। 'অ্যাক্সরেডের সব কুত্তাই হয়তো সব সময় ঘেউ ঘেউ করে, লোকের গা সওয়া হয়ে গেছে,' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো।

গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুললো সুজা। ভেতরে কাগজপত্র, কিন্তু একটা স্কি মাস্কও নেই। ম্যাপ আছে, চামড়ার একজোড়া দস্তানা আছে।

সামনের দুটো সিটের মাঝের ফাঁকে, মেঝেতে পড়ে থাকা হলুদ রঙের একটা প্যাড চোখে পড়লো তার। কি ভেবে নিচু হয়ে তুলে নিলো। প্যাডের ভেতর থেকে খসে পড়লো একটা খাম। চিঠি হতে পারে। তুলে নিলো ওটা।

একনজর দেখেই বলে উঠলো, 'গাড়িটা বোধহয় ব্যানারের নয়। এই দেখো।'

রেজাও দেখলো। খামের ওপর নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে: মেল ব্রোন, স্কেলিটন রাইডার র‍্যাঞ্চ, অ্যাক্সরেড। প্রেরকের ঠিকানাও লেখা রয়েছে এককোণে। লন্ডন-এর একটা সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কার্মের ঠিকানা।

ভেতরে একটা ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া গেল, চিঠি। জোরে জোরে পড়লো সুজা:

'ডিয়ার মিস্টার ব্রোন,

আপনার পরিকল্পনা ভালোমতো খতিয়ে দেখলাম। লটনের ক্যানারি রিভার থেকে অ্যাক্সরেডে আপনার র‍্যাঞ্চে পানি নিয়ে যাওয়ার আইডিয়াটা ভালোই। কিন্তু আমি সেটা করার পরামর্শ দিতে পারছি না। অনেক, অনেক খরচ পড়বে।'

নিচে এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের পক্ষে একজনের নাম সই করা।

'বুঝলাম না,' সুজা বললো, 'এতোদূর থেকে পানি আনতে চায় কেন? এখানে কি পানির অভাব?'

'কি জানি, হয়তো ওর জায়গায় নেই। কিংবা অ্যাক্সরেডে মাটির নিচে পানির স্তর শুকিয়ে আসছে।' আরাম করে সিটে হেলান দিলো রেজা। 'তারিখটা দেখো তো কবের?'

'গতকাল,' চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে আবার প্যাডের ভেতরে রাখলো সুজা। 'ব্যানারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তো মেল ব্রোনের?'

'থাকতে পারে।' কাত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো রেজা। বিড়বিড় করলো, 'আশ্চর্য!'

'কী? কিছু দেখেছো?'

'কুকুরগুলো রা করে না কেন?'

আরেক দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। তারপর উল্টো দিকের জানালা দিয়ে। 'রা করবে কি। নেই তো।'

'নেই!' রীতিমতো অবাক হলো রেজা। সামান্য সময় অপেক্ষা করেই বিরক্ত হয়ে চলে গেল একদল ট্রেনিং পাওয়া প্রহরী কুকুর? নাকি ডেকে নিয়ে গেল কেউ? তাহলে আওয়াজ শুনলো না কেন? হতে পারে, ডগ হুইসেল বাজিয়ে ডেকেছে। সে-জন্যেই কোনো যাও এখান থেকে

শব্দ শোনা যায়নি। তাহলে কি ইচ্ছে করেই পাঠানো হয়েছিলো ওগুলোকে? জানে, রেজা আর সুজা আছে ভ্যানে? কে পাঠিয়েছে? হ্যারি ব্যানার? চকিতে প্রশ্নগুলো খেলে গেল তার মনে। যা-ই হোক, তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

'চলো,' সুজার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো রেজা।

কিন্তু সুজা হ্যাণ্ডেল ধরার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। তার চোয়ালে এসে লাগলো ডবল ব্যারেল শটগানের চকচকে নলের মুখ।

ছয়

কথা সরছে না দু'জনের মুখ দিয়ে। নিঃশ্বাস নিতে ভয় পাচ্ছে। চেয়ে আছে বন্দুকের নলের দিকে। ওরা যেদিকে সরছে, নলের মুখও সঙ্গে সঙ্গে সরছে সেদিকে। যেন শিকারকে অনুসরণ করছে বিষাক্ত গোখরো, ছোবল হানার জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

'এ-দুটোকে চেনো, মেল?' অদৃশ্য কারো উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলো শটগান-হাতে লোকটা।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরেকজন, প্রথমজনের চেয়ে বয়েস অনেক কম।

'না, হ্যারি,' মাথা নাড়লো মেল, 'চিনি না।' কেমন যেন আড়ষ্ট কণ্ঠ। 'তুমি?'

কাদের মুখোমুখি হয়েছে, বুঝলো দুই ভাই। বন্দুক যার হাতে, সে হ্যারি ব্যানার। বয়েস পঞ্চাশ, রোদে পোড়া চামড়া, দীর্ঘ দিন রোদের মধ্যে কাজ করার ফল। নীল জিনসের প্যান্ট জায়গায় জায়গায় কুঁচকে রয়েছে, ঠেলে বেরোনো মস্ত ভুঁড়ির নিচে ঝুলে যাও এখান থেকে

আছে, জোরে নাড়া লাগলেই যেন খসে পড়ে যাবে।

মেল ব্রোনের বয়েস আটাশ-উনত্রিশ। লাল চুল। চওড়া কানা-ওয়ালা কাউবয় হ্যাটের কারণে ঘন ছায়া পড়েছে মুখে, কিন্তু তার পরেও রোদে পোড়া চামড়ার ওপর কালো কালো ফুটকিগুলো দেখা যায়। সুজা অনুমান করলো, ভ্যানটা এই লোকেরই।

'আমার গাড়ির সর্বনাশ করে দিয়েছে!' কেঁদে ফেলবে যেন ব্রোন। ভ্যানের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'দেখো, কি অবস্থা করেছে! ইস্, এতো পয়সা খরচা করে ছবিটা আঁকা-লাম হায় হায়রে!'

'আমরা করিনি,' হাত নাড়লো সুজা। 'করেছে ওই কুত্তাগুলো।'

'আবার কথা বলে!' আচমকা গর্জে উঠলো ব্রোন। খুন করবো ...মেরে ফেলবো আমি তোমাদেরকে আমার গাড়ি...'

কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিলো ব্যানার। 'হয়েছে হয়েছে, থামো,' শান্ত কণ্ঠস্বর। 'আবার নতুন করে করিয়ে নিও, আমি টাকা দেবো।'

কতোখানি আশ্বস্ত হলো ব্রোন, বোঝা গেল না। তবে আর আফসোস করলো না। ঘুরে, ভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। দৃষ্টি চলে গেছে অনেক দূরে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলো, হ্যারি ব্যানারকে ভয় পায় সে।

ভয় পাওয়ানোর অদ্ভুত এক ক্ষমতা রয়েছে হ্যারি ব্যানারের মাঝে, সেটা রেজা আর সুজাও বুঝতে পারলো। সেটা তার চেহারায় নয়, কণ্ঠস্বরে—ভারি, মসৃণ। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা এখানে কি করছো? আমার এলাকায় ঢোকার

সাহস কোথায় পেলে ?'

'ঘুরতে এসেছি,' মিথ্যে বললো রেজা। 'আমরা ভেবেছি এটা সরকারি জায়গা।'

'কিছু বোঝার আগেই তাড়া করলো পাগলা কুত্তার দল,' ভাইয়ের কথার পিঠে বললো সুজা। 'কারো পোষা কুত্তা। ওই ভ্যানে না ঢুকলে ছিঁড়ে খেয়েই ফেলতো আমাদের।'

'এটা সরকারি জায়গা নয়,' ব্যানারের কণ্ঠস্বরের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না। 'ব্যানার র‍্যাঞ্চ। কুকুরগুলোকেও বাধ্য হয়েই পালতে হয়, নইলে আমার স্ত্রী ভয় পায়। নিরাপদ বোধ করে না।'

'দুঃখিত, ভাই, আপনার ভ্যানটার জন্যে,' ব্রোনের দিকে তাকিয়ে বললো রেজা, সত্যি খারাপ লাগছে তার।

সেটা বুঝতে পারলো ব্রোন। কঠিন দৃষ্টি কিছুটা নরম হলো।

'ওই মোটর সাইকেল ?' বন্দুকের নল হারলে-ডেভিডসনটার দিকে নাড়লো ব্যানার। 'রবার্ট গার্ডনারের গাড়ি তোমরা পেলে কি করে ?' চোয়াল চুলকালো সে।

'মিসেস গার্ডনার দিয়েছেন,' রেজা বললো। 'অ্যাক্সরেড ঘুরে-ফিরে দেখার জন্যে।'

'শেলি দিয়েছে ?' অনেকটা প্রশ্ন, অনেকটা মন্তব্যের মতো শোনালো কথাটা। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'দেখো, কুকুরগুলোকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। ছাড়া থাকতে থাকতে স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে। তোমরা এখন যাও।'

'কিভাবে যাই,' সুজা বললো। 'মোটর সাইকেল খারাপ হয়ে গেছে। স্টার্ট হয় না।'

'মেল, ছেলেগুলোকে দিয়ে এসো না শহরে? বাইকটা শেলির কাফেতে পৌঁছে দেবো'খন আমি।'

'আমি পারবো না,' থমথম করছে ব্রোনের চেহারা। 'কেন যাবো? আমার গাড়ির সর্বনাশ করে দিয়েছে ওরা।'

'যাবে, কারণ আমি বলছি,' কণ্ঠস্বর সামান্য খাদে নেমে গেল ব্যানারের।

ওটুকুই যথেষ্ট। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো ব্রোন, তারপর গিয়ে টেনে খুললো ড্রাইভারের দরজা।

'দেখো ছেলেরা,' ব্যানার বললো, 'আর যেন হারিয়ে যেও না। সাবধান।'

ভ্যানে উঠে বসলো রেজা আর সুজা।

স্টার্ট দিলো ব্রোন।

অ্যাক্সরেডের দিকে ছুটলো গাড়ি। বেশ জোরে চালাচ্ছে ব্রোন, ওয়েস্টার্ন হাইওয়েতে অনেকেই ওরকম জোরে চালায়। চুপচাপ, নিজে থেকে কিছু বলবে না বোঝা গেল। তথ্য আদায়ের জন্যে শেষে দুই ভাইকেই অগ্রণী হতে হলো।

'অনেক বড় র‍্যাঞ্চ মিস্টার ব্যানারের,' পাসেঞ্জার সিটে বসা রেজা বললো, যেন কথার কথা।

'হ্যাঁ,' ব্রোনের দৃষ্টি পথের ওপর নিবদ্ধ।

'তাঁর চাকরি করেন?' যেন চিঠিটার কথা কিছুই জানে না রেজা।

তার দিকে একবার চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিলো ব্রোন। 'আমার নিজের র‍্যাঞ্চ আছে।'

'তাহলে নিশ্চয় অ্যালাউন্স পান মিস্টার ব্যানারের কাছ থেকে,'

ফস করে বলে বসলো পেছনের সিটে বসা সুজা।

কথাটা যেন শুনতেই পেলো না ব্রোন। 'স্কেলিটন রাইডার অনেক আগে থেকেই আমাদের। আমার দাদার বাবা এসে তৈরি করেছিলো।'

ফিরে সুজার দিকে তাকালো একবার রেজা, চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালো সে, আগের মতো।

সংকেতটা বুঝতে পেরেছে সুজা। ব্রোনের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে বলেছে।

'শুনলাম, বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার জায়গা আছে মিস্টার হ্যারির র‍্যাঞ্চে,' সহজ গলায় বললো রেজা।

তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সুজা। পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না ব্রোনের মুখ। শুধু মনে হলো, চোয়ালের নিচটা যেন সামান্য কেঁপে উঠলো লোকটার।

'বড় বেশি উৎসাহ তোমাদের। অন্য লোকের কাজে নাক গলানো উচিত না, এটা কেউ শেখায়নি বোঝা যাচ্ছে।'

'ভাবছি, বর্জ্য ফেলা হয় কোন জায়গায়? বিষাক্ত রাসায়নিক জমির অনেক ক্ষতি করে। গাছপালা ধ্বংস করে। মিস্টার হ্যারির বাড়ির চারপাশে গাছপালা, ঝোপ, ঘাস বেশ তাজাই দেখলাম। নষ্ট হওয়ার চিহ্ন নেই।'

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো ব্রোন। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো চাকা, ক্ষয় হয়ে গেল টায়ার। ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়ি। 'যাও, নামো!' কর্কশ গলায় আদেশ দিলো সে।

শহর এখনও দূরে। কিন্তু নামতে হলো দুই ভাইকে। গাড়ি

ঘুরিয়ে ফিরে চললো ব্রোন।

'কেমন লাগলো?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'মেল ব্রোন কে? জানি না। তবে প্যান্টের নিচের দিকে ছেঁড়া। সেদিন রাতে পাঁচজনের একজনের ওরকম ছিলো।'

'দেখেছি।'

অ্যাক্সরেডে পৌঁছে প্রথমেই শেলিকে একটা যুতসই কৈফিয়ত দিতে হলো, মোটর সাইকেলটার জন্যে।

আনমনে মাথা নাড়লো শেলি, 'আমার আর আক্কেল হবে না কোনোদিন।' কিন্তু তেমন রেগেছে মনে হলো না।

এরপর ডিন মার্টের গ্যারেজে গেল দু'জনে, গাড়ি ঠিক হয়েছে কিনা দেখার জন্যে।

গলা ফাটিয়ে ক্যানক্যানে চিৎকার করছে মেকানিকের ক্যাসেট প্লেয়ার, রক মিউজিক, সঙ্গীতের চেয়ে কোলাহল বেশি। দুই ভাইকে দেখেই বন্ধ করে দিলো ডিন।

'গাড়ির কি খবর?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'বেল্টটা মেরামত করেছি কোনোমতে। কিন্তু পাম্প হবে না। আরেকটা পাম্প দরকার। কেন, বেশি তাড়াহুড়া?'

মাথা ঝাঁকালো রেজা, সুজা, দু'জনেই।

উজ্জ্বল হলো মেকানিকের মুখ। 'অ্যাক্সরেড থেকে চলে যাচ্ছো!'

'না না,' সুজা বললো। 'গাড়ি ছাড়া হয় না। পায়ে হেঁটে আর কতো ঘুরবো?'

ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল ডিন। তারপর ছোট্ট কাশির মতো হাসি দিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল তার কাজে। 'গণ্ডগোল না

যাও এখান থেকে

বানিয়ে যাবে না।'

'নতুন করে আর কি বানাবো?' রেজা বললো। 'যেগেই তো গেছে। দু'বার। একবার, পরশু রাতে পার্কে। আরেকবার, কাল সকালে, শেলি গার্ডনারের কাফেতে।'

'কাল আবার কি হয়েছিলো?' অবাক মনে হলো ডিনকে।

'তেমন কিছু না। টম ডেনভার আর নীল হ্যামার নাকে দুটো ভাঁড় "ওল্ড ওয়েস্ট ওয়েস্ট" খেলতে চাইছিলো।'

'কেন, আপনি শোনেননি?' সুজা বললো। 'আশ্চর্য! সেভাবে খবর ছড়ায় এ-শহরে ··যেন রোডের ধারে থেকে আপনি শোনেননি বিশ্বাস করতে বলেন?'

অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটলো ডিনের চোখে, যেন বহুদূরে তাকিয়ে আছে, মনস্থির করে নিতে চাইছে কোনো ব্যাপারে। পিকআপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুখে কিছু না বলে আঙুল দিয়ে গাড়ির দরজায় লিখলো: বেড়ার কাছে খোঁজো দরজায় লেগে থাকা পুরু ধুলোর কারণে স্পষ্ট হয়ে ফুটলো লেখাগুলো।

মেসেজ! নীরবে লেখাটার দিকে তাকিয়ে আছে রেজা। মুখ খুলতে যাবে, এই সময় পেছনে শুনলো পদশব্দ। মিষ্টি কণ্ঠে ডাক শোনা গেল, 'হাই, ডিন।'

হাত দিয়ে ডলে তাড়াতাড়ি লেখা মুছে ফেললো মেকানিক।

কে এসেছে দেখার জন্যে ফিরে তাকালো রেজা আর সুজা।

তরুণী। বয়েস বিশ-বাইশ। পরনে খাটো ডেনিম স্কার্ট, পায়ে লাল টেনিস শু, মাথায় লাল হ্যাট। গ্যারেজে ঢুকে ভুরভুর করে সুগন্ধী সাবানের সুগন্ধ ছড়ালো বাতাসে। প্রচুর সাবান মেখে যাও এখান থেকে

নিশ্চয় গোসল করে এসেছে এইমাত্র।

'হাই, মেরি,' খুশি হওয়ার চেষ্টা করলো ডিন, কণ্ঠের অস্বস্তি দূর হলো না।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা।

মেরিনা-ই আবার মুখ খুললো। পরিচয় দিলো, 'আমি ডিনের বোন। ও তো পরিচয় করিয়ে দেবে না...'

'তুমি এখানে কেন এসেছো, মেরি?' বাধা দিয়ে বললো ডিন। অস্বস্তি বেড়েছে তার।

'কেন, দোষ হয়েছে নাকি?' মৃদু হাসলো মেরিনা। 'বিনা কাজে আসিনি, ডিন। আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে, ধার।' অচেনা লোকজনের সামনে ধার চাইছে, বিন্দুমাত্র লজ্জিত মনে হলো না মেয়েটাকে।

'তোমার স্বামীর কাছে চাইছো কেন?'

'শুকনো কুয়ায় কলসি ফেলে কি লাভ?' হাসলো মেরিনা।

অফিসের দিকে চলে গেল ডিন।

'তোমাদের কথা শুনেছি,' দুই ভাইকে বললো মেরিনা 'তুমি করে বলে ফেললাম ভাই, কিছু মনে করো না। আপনি টাপনি আসে না আমার। সেদিন রাতে পার্কে নাকি খুব মেরেছিলো। শুনে যা খারাপ লাগলো না! আমাদের শহরে এসেছো...'

'আরে না না, আপনার খারাপ লাগার কি আছে,' সহজেই সুভার মন গলিয়ে ফেলেছে মেরিনা। 'আপনি তো আর মারেননি।'

'পুব থেকে এসেছো, ঠিক বলিনি? আমি আটলান্টিক সিটি পর্যন্ত গিয়েছি।'

'ভালোই করেছেন।' রসিকতা করলো রেজা, 'এর পরে আর গেলে পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেতেন।'

'অ্যাঁ! ও, আটলান্টিকের কথা বলছো? হি-হি! আটলান্টিক মহাসাগর,' কথা শেষ করে আবার হাসলো মেয়েটা।

ওর আন্তরিক হাসি দুই ভাইকে ভুলিয়ে দিলো যে ওরা অ্যাক্স-ব্লেডে রয়েছে, যেখানে প্রায় সবাই ওদের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়।

'এই, ওয়েস্টার্ন খাবার কেমন লাগে তোমাদের? বাড়িতে রান্না হলে?' দাওয়াত দিয়ে ফেললো মেরিনা, 'চলে এসো না আজ রাতে। নাকি অন্য কোনো প্ল্যান আছে?'

'নেই। থাকলেই বা কি? এরকম দাওয়াত বাদ দেয় কে,' হেসে বললো সুজা।

সুজার এতো তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলো রেজা। রেস্টুরেন্টের খাবার পছন্দ করে না।

হাতে কয়েকটা দশ ডলারের নোট নিয়ে ফিরে এলো ডিন। দিলো বোনকে।

'থ্যাংকস, ডিন,' বললো মেরিনা। 'চুমু খেতে ইচ্ছে করছে তোমাকে। কিন্তু খাবো কোথায়? সারা মুখে তো কালিঝুলি আর গ্রিজ।' কাঁধেঝোলানো খড়ের ছোট ব্যাগ খুলে নোটগুলো ঢুকিয়ে রাখলো। 'ওদেরকে দাওয়াত দিলাম আজ রাতে। তুমিও আসো না?'

'আমি যেতে পারবো না,' হাত নাড়লো মেকানিক।

'কেন, আমার রান্না খারাপ?'

'কেন যাবো না, ভালো করেই জানো।'

বোনের দিকে এক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলো ভাই। কি যেন বলতে চায়। কোনো একটা ব্যাপারে একমত নয় দু'জনে।

ব্যাগ থেকে কাগজ-কলম বের করে ঠিকানা লিখে রেজার হাতে দিয়ে বললো মেরিনা, 'এই ঠিকানায় যেও। ঠিক ছ'টায়।'

'থ্যাংকস,' রেজা বললো।

মেরিনা বেরিয়ে যেতেই সুজা জিজ্ঞেস করলো, 'বেড়ার কাছে খোঁজো বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন?'

'কই, বললাম নাকি?' চট করে গ্যারেজের চারপাশে চোখ বোলালো ডিন, যেন আড়ি পেতে তার কথা শুনে ফেলছে কেউ। চোখে অস্বস্তি। টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে পিকআপের এঞ্জিনের ওপর ঝুঁকলো। আর একটা কথাও বললো না।

বাইরে বেরিয়ে 'কোথায় যাবে' রেজাকে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'রহস্য জটিল হচ্ছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো রেজা।

'চলো না গিয়ে নিকুকে জিজ্ঞেস করি। অনেক কিছু জানে ও।'

'চলো।'

কাফের দিকে রওনা হলো দু'জনে। বিকেলের কড়া রোদ থেকে বাঁচার জন্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে ছায়ায় ঢুকতে চায়। কয়েক পা যেতে না যেতেই ডাক শুনলো, 'এই ছেলেরা! এই···এই···'

ফিরে তাকিয়ে দেখলো দু'হাত তুলে প্রায় লাফাচ্ছে পেটুক বুড়ো।

'কি হয়েছে?' রেজা জানতে চাইলো।

'আগুন! আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে!'

'একবার তো বোকা বানিয়েছেন,' হেসে বললো সুজা। 'নতুন কিছু বলুন।'

'না না, এবার সত্যি সত্যি!'

উলফ রেনের ভাবভঙ্গিতে সন্দেহ হলো রেজার, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে গ্যারেজের পাশ ঘুরে গিয়ে তাকালো। একবার চেয়েই দিলো দৌড়।

সাত

আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশি। ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে বেরোচ্ছে। আশা করলো দু'জনেই, পেট্রোল ট্যাংকে লাগার আগেই নিভিয়ে ফেলতে পারবে।

'আরিব্বাবা, কি আগুন লেগেছে!' চেঁচিয়ে উঠলো উলফ।

দৌড়ে গ্যারেজে ঢুকলো রেজা। ডিন কোথায়? একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দরকার।

অফিসে রয়েছে মেকানিক, টেলিফোনে কথা বলছে। রেজাকে দেখে চমকে উঠলো। আগুনের খবর শুনে হাত থেকে ছেড়ে দিলো রিসিভার। দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে ছোট, হালকা একটা এক্সটিং-গুইশার খুলে নিয়ে রেজার দিকে ছুঁড়ে দিলো। নিজে খুলে নিলো বড় আরেকটা।

দু'জনেই ছুটে বেরোলো বাইরে।

আগুন নেভানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে সুজা। ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজা খুলে ফেলেছে। ভ্যানের পেছন থেকে একটা কম্বল

যাও এখান থেকে

বের করে এনেছে, বাড়ি মেরে নেভানোর চেষ্টা করছে আগুন।

'আরিব্বাবা, কি আগুন!' আবার চিৎকার করে উঠলো বুড়ো।

লোকটার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হলো রেজার, অনেক কষ্টে সামলালো নিজেকে। ঝালটা গিয়ে ঢাললো আগুনের ওপর। তাতে অবশ্য কাজ হলো। আগুন নিভলো। অগ্নি-নির্বাপক রাসায়নিকের পুরু, ঠাণ্ডা ফেনা ঢেকে দিয়েছে ভ্যানটাকে।

হাত থেকে এক্সটিংগুইশার ফেলে ওটার ওপরই বসে পড়লো ডিন। কপালের ঘাম মুছলো।

গাড়ির ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে উঁকি দিলো রেজা। নাকে ঢুকলো ধোঁয়ার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ, পানি বেরিয়ে এলো চোখ থেকে।

ড্রাইভারের সিটটা পুড়ে শেষ। ড্যাশবোর্ড আর জানালারও ক্ষতি হয়েছে। লাগলো কি করে আগুন? নিশ্চয় ন্যাকড়া পেট্রোলে ভিজিয়ে, আগুন লাগিয়ে জানালা দিয়ে সিটে ফেলে গেছে। দুর্ঘটনা নয়। কে করলো কাজটা?

সুজার চেহারা থমথমে।

'ভেবো না,' ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো রেজা। 'সহজেই মেরামত হবে।'

'কোন্ হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত চাপলো সুজা। দুর্ঘটনা যে নয় বুঝতে পেরেছে।

'আমার দিকে চাইছো কেন?' তাড়াতাড়ি বললো ডিন। 'আমি কিছু করিনি। তবে আমারও দোষ আছে। বাইরে রেখেই ভুল করেছি। আর রাখবো না, এবার থেকে ভেতরে...' কতগুলো বাতিল টায়ার দেখিয়ে বললো, 'আমি না থাকলে চাবি ওখানে রেখে

যাবো। যখন ইচ্ছে ঢুকতে পারবে।'

খুশি হতে পারলো না সুজা। জোরে ভ্যানের দরজা লাগিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

দ্রুত তার কাছাকাছি হলো রেজা। 'এই, এতো মাথা গরম করছো কেন? ডিন না-ও তো হতে পারে?'

'তাহলে কে?'

'আগুন লাগার খবরটা আমাদের কে দিয়েছে?'

আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না বুড়োকে। কোন ফাঁকে চলে গেছে। পাওয়া গেল খানিক পরেই, শেলির কাফেতে। বসে আছে তার প্রিয় টেবিলটায়, জানালার পাশে। এমন ভাবে তাকালো, যেন জানতো রেজা আর সুজা আসবেই। তাদের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছে। দেখেই হাত তুললো, 'এই, এসো।' ওরা বসলে বললো, 'আরিব্বাবা, কি আগুন লেগেছে। যাক, ভালোই কাটলো, দারুণ উত্তেজনা...'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে,' গম্ভীর হয়ে বললো রেজা।

'নিশ্চয়ই। আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক, খালি পেটে জমে না। কথা বলতে পারি না আমি। বেশি মশলা দেয়া খাবার খেলেই ভালো, শরীর ভালো থাকে। জানো না বোধহয়, দেড়শো বছর বেঁচে থাকার ওটাই গোপন রহস্য, মশলা। এই যে দেখো না, এক-শো বিশ বছর হয়ে গেছে আমার। দেখে মনে হয়?'

রেজা, সুজা, দু'জনেই মাথা নাড়লো। মশলার ব্যাপারে বিন্দু-মাত্র আগ্রহ নেই ওদের। আর পেটুক বুড়ো যে বয়েস অন্তত চল্লিশ বছর বাড়িয়ে বলেছে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

যাও এখান থেকে

ন্যাপকিনের ভাঁজ খুলতে খুলতে বুড়ো রসিকতা করলো, 'আমার আঙুল কাটলে কি বেরোবে জানো? চিলি সস। হেহ্ হেহ্ হে!'

'গাড়িটায় আগুন কে লাগালো, বলুন তো?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলো রেজা, ভূমিকার মধ্যে গেল না।

'আগে খাওয়া,' বুড়োর ভুরু নাচানো দেখেই বোঝা গেল, কিছু জানে সে।

'কাউকে গাড়িটার কাছে দেখেছেন?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'দেখেছিও বলবো না। দেখিনিও বলবো না।'

'মানে?'

'আগে খাওয়া,' আগের মতো একই কণ্ঠে বললো বুড়ো। 'খালি পেটে কথা বলতে পারি না আমি।...এই যে, শেলি, এদিকে এসো। আমার জন্যে এক বাটি চিলি।'

'টাকাটা কে দেবে শুনি? তোমাকে আর বাকি খাওয়াতে পারবো না আমি।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে রেজা-সুজাকে দেখালো উলফ।

'ঠিক আছে, দেবো,' রেজা বললো।

'দুই বাটি!' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো উলফ।

'টাকা দেবো, কিন্তু আগে বলতে হবে, কে আমাদের গাড়িতে আগুন লাগিয়েছে।'

'শুনেছি, আগুন লেগেছে,' শেলি বললো।

'লাগানো হয়েছে,' শুধরে দিলো সুজা।

'শুনেই বুঝেছি,' কণ্ঠস্বর খাদে নামালো শেলি। 'কিন্তু ফায়ার চিফকে জিজ্ঞেস করো গিয়ে, বলবে, কোনো কারণে লেগেছে। যে-যাও এখান থেকে -

টার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এই এক কথা বলেই শেষ। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর কাফেতেও তিনবার লেগেছে। তিনবারই ওই কথা বলেছে চিফ। তা তোমাদের গাড়িটা কি বেশি পুড়েছে?'

'গাড়ির ক্ষতি তেমন হয়নি। তবে জরুরি কাগজপত্র পুড়েছে। একটা ম্যাপও নেই।'

'উলফ,' বুড়োর দিকে তাকালো শেলি, 'সত্যি সত্যি কিছু দেখে থাকলে বলে দাও।'

দু'হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে বললো উলফ, 'কাউবয়!'

'চমৎকার!' রেজা বললো। 'দেখতে কেমন?'

নিচের ঠোঁট কামড়ালো বুড়ো। 'ইয়ে, গ্যারেজের ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—সারাক্ষণই তো হাঁটাহাঁটি করি, এক জায়গায় দেখি মাটিতে একটা ডলার পড়ে আছে।' পকেট থেকে নোটটা বের করে দেখালো সে। 'টাকাটা তোলার সময় ওর বুট চোখে পড়লো। চলে যাচ্ছে। শুধু জুতো দেখেছি, মুখ দেখিনি। আমি নিচু হয়ে থাকতে থাকতেই গায়েব হয়ে গেল। জুতোর গোড়ালিতে সোনার পাত লাগানো।'

চট করে শেলির দিকে তাকালো রেজা। 'চেনেন?'

আরেক দিকে মুখ ফেরালো শেলি, জবাব দিলো না। চিন্তিত।

'আমার চিনি পাবো তো?' উদ্বিগ্ন মনে হলো বুড়োকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলো রেজা।

'আর কিছু ক্র্যাকার,' শেলিকে বললো উলফ। 'ভেতরে ঝিনুকের পুর দেয়া। বেশি করেই দিও।'

'তোমরা কিছু খাবে?' ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করলো শেলি।

যাও এখান থেকে

'না, এখন না।'

উলফের জন্যে চিলি সস আনার জন্যে রান্নাঘরে চললো শেলি। যাওয়ার পথে আরেক টেবিল থেকে কয়েকটা এঁটো প্লেট তুলে নিলো।

মিনিট দুই পরেই বড় বড় দুই বাটি চিলি, আর একটা ডিশে ক্র্যাকারের ছোটখাটো এক পাহাড় নিয়ে এলো নিকু। তাকে টেবিলে রাখার সময় দিলো না পেটুক বুড়ো। খাবলা দিয়ে একটা ক্র্যাকার তুলে কামড় বসালো।

ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে চিলি খেতে লাগলো বুড়ো।

'কতদূর এগোলেন?' দুই ভাইকে জিজ্ঞেস করলো নিকু।

'নাহ্, সুবিধে করতে পারিনি,' রেজা বললো। 'আচ্ছা নিকু, একটা কথা বলো তো, লটনের ক্যানারি রিভার থেকে খাল কেটে যদি কেউ পানি আনতে চায় এখানে, কেমন হয়?'

'স্রেফ পাগলামি।'

'কেন? মেল ব্রোন যদি চায়?'

'তাহলে তো পাগলামি আরও বেশি হবে। তার ওখানে পানি যথেষ্ট আছে। র‍্যাঞ্চের ভেতর দিয়েই গেছে রুবি রিভার। এখানে আরও অনেক র‍্যাঞ্চার রুবির পানি ব্যবহার করে।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করলো উলফ। 'ভুল।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালো সুজা।

'আমার গরু থাকলে কিছুতেই রুবির পানি খেতে দিতাম না,' ঘুরিয়ে জবাব দিলো উলফ।

'কেন?' রেজার প্রশ্ন।

'বিষ।' আরেক চামচ সস মুখে পুড়লো বুড়ো। দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলো রেজা আর সুজা। চোখ বড় বড় করে আনমনে মাথা নাড়ছে নিকু।

আরও কয়েক চামচ সস গিলে মুখ তুললো বুড়ো। 'ওই যে বিষ নিয়ে গিয়ে ঢালছে ব্যানারের ওখানে, তাতেই ছড়াচ্ছে। ভেবেছে মাটির তলায় পুঁতে দিলেই সেরে গেল,' টেবিলে কিল মারলো সে। 'ভুল। সাংঘাতিক ভুল করছে। প্রকৃতির কাছ থেকে লুকানো যায় না। সবখানে চোখ আছে।'

চেয়ারে হেলান দিলো রেজা।

তর্ক শুরু করলো নিকু, 'ভুল করেছো তুমি, উলফদাদু। হতেই পারে না। বিষ ফেলছে যেখানে, সেখান থেকে রুবি রিভার বিশ মাইল দূরে।'

টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলো উলফ। দাড়ি থেকে চিলির বাটিতে গড়িয়ে পড়লো এক ফোঁটা সস। যেন গোপন কোন কথা বলছে এমন ভাব করে বললো, 'ওপর থেকে বিশ মাইল দূরে। কিন্তু জানো, রুবি কোত্থেকে বেরিয়েছে? মাটির নিচের একটা ঝর্না থেকে। ওই ঝর্না বইছে ব্যানারের জমির নিচ দিয়ে। বিষের গাদার খুব কাছাকাছি।'

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে উলফ, তাতে কড়া মশলার গন্ধ।

'হুঁম্‌ম্‌!' মাথা দোলালো রেজা। 'এটাই ব্যাখ্যা। কাছে নদী থাকতেও কেন দূর থেকে পানি আনতে চায় ব্রোন।'

'কিন্তু উলফদাদু,' নিকুর ঠোঁটের কোণে হাসি, অনেকটা বয়স্ক-দের মতো, 'যদি রুবির পানি দূষিতই হবে, ব্যানারের গরুমোষের অসুখ হয় না কেন? কেন মরে না? একটা গরু মরেছে বলেও শুনিনি কারো কাছে।'

'হয় কিনা কে জানতে যাচ্ছে? ব্যানার বলবে না।'

'তাহলে ব্রোন বলতো। তার গরুমোষ মরলে কিছুতেই চুপ করে থাকতো না। ঘোরতর শত্রু হয়ে যেতো একে অন্যের।'

'শত্রু কিনা সেটাই বা কি করে জানছো?' বলে এক মুহূর্ত গুম হয়ে রইলো বুড়ো। তারপর বললো, 'দেখো, অ্যাক্সরেড আমার চেনা। এখানকার বন-বাদাড়, পাহাড়, তৃণভূমি আমার বাড়িঘর। এখানকার প্রকৃতি আমার সঙ্গে কথা বলে। জানোয়ারেরা আলাপ করে। এমনকি মেঘেরাও আমার কাছে চিঠি পাঠায়।' হঠাৎ উঠে গটমট করে বেরিয়ে গেল উলফ।

এগিয়ে এলো শেলি। 'ওরকম করে চলে গেল কেন?'

'বোধহয় মনে ব্যথা দিয়েছি।' রেজা বললো।

'অন্য কারণও হতে পারে। সাধারণত কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলেই ওরকম করে চলে যায় বুড়ো, এড়িয়ে যায়।'

'আপনি জানেন?' সুজা জিজ্ঞেস করলো। 'পানির নিচের ঝর্না নাকি রুবি নদীর উৎস?'

'জানি না,' মাথা নাড়লো শেলি।

'একটাই উপায় আছে জানার,' রেজা বললো। 'গিয়ে দেখা।'

'কখন? রাত্রে?' সুজা প্রশ্ন করলো।

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'হুঁশিয়ার থাকবো, যাতে এবার আর যাও এখান থেকে

কেউ তাড়াতে না পারে আমাদের।'

'এখন খাবে? খিদে লেগেছে?' অন্য প্রসংগে চলে গেল শেলি।

'দিন কিছু। তবে রাতে আর খেতে আসবো না। দাওয়াত আছে।'

'কে আবার দাওয়াত দিলো?' অবাক মনে হলো শেলিকে। 'অ্যাক্সরেডে নতুন বন্ধু জুটিয়েছো?'

'ডিন মার্টের বোন,' সুজা জানালো। 'গ্যারেজে দেখা। কয়েক কথায়ই বন্ধু বানিয়ে ফেললো আমাদের।...আপনি খুশি হতে পারছেন না মনে হচ্ছে?'

'মেরিনা মার্ট নীল হ্যামারকে বিয়ে করেছে,' টেবিল সাফ করতে করতে বললো শেলি।

থমকে গেল দুই ভাই। তাকালো পরস্পরের দিকে। যে তাদের-কে ধরে পেটালো, সেই লোকের স্ত্রী তাদের প্রতি এত সদয় কেন?

এই প্রশ্নের জবাব জানারও একটাই উপায়, রেজা ভাবলো। দাওয়াতে যেতে হবে।

ছটা বাজতে দেরি আছে। সময় কাটানোর জন্যে কাফে পরি-ষ্কার করতে শেলিকে সাহায্য করলো দুই ভাই। লাঞ্চের সময় শেষ, এখন ভিড় কম।

ছটা বাজার কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে পড়লো কাফে থেকে। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস। খানিক আগেও প্রচণ্ড গরম ছিলো, বোঝাই যায় না।

মেইন স্ট্রিট ধরে নীরবে এগোলো ওরা।

সহজেই ঠিকানা খুঁজে বের করলো। ছোট একটা হলদে রঙের

বাড়ি। কাঠের নিচু বেড়া। চোখা করে দেয়া হয়েছে সরু তক্তা-গুলোর ওপরের দিক। কাঠের গেট খুলে ভেতরে পা রাখলো রেজা। তাকালো আশেপাশে। অস্বস্তি বোধ করছে। কাউকে চোখে পড়লো না।

'আমার কেমন জানি লাগছে, দাদা!'

ডাকবাক্সে লেখা নাম দেখে আরও দমে গেল দু'জনে। হ্যামার কিংবা মার্ট নয়, জেরিমোর। অন্যের বাড়ির ঠিকানা দিলো নাকি ডিনের বোন? আলোও নেই ঘরে, জানালাগুলো অন্ধকার। বাড়িতে মানুষ নেই নাকি?

বারান্দায় উঠলো দু'জনে।

মেরিনার নাম ধরে ডাকলো রেজা।

সাড়া নেই।

বেল টিপলো। ভেতরে আওয়াজ হলো ঘণ্টার। অপেক্ষা করলো সে। আবার টিপলো। কিন্তু কেউ দরজা খুললো না।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল ভেজানো পাল্লা। ভেতরে ঢুকলো রেজা। পেছনে সুজা।

কাউকে পাওয়া গেল না।

আবার বেরিয়ে এলো ওরা।

অন্ধকারের বেশি দেরি নেই। কি করবে এখন? আবার ফিরে যাবে শেলির কাফেতে? যাওয়াই দরকার। রাতের খাবার অন্তত লাগবে।

নির্জন পথ ধরে আবার ফিরে চললো দু'জনে।

এই সময় কানে এলো পুলিশের সাইরেন।

আট

ঘ্যাঁচ করে এসে পাশে ব্রেক কষলো গাড়ি। দরজা খুলে গেল। পিস্তল হাতে বেরিয়ে এলো শেরিফ। ধমক দিয়ে বললো, 'যাও, গাড়িতে ওঠো।'

'কেন?' রেজার প্রশ্ন।

'অ্যারেস্ট করা হলো তোমাদের। চুরির অভিযোগে।'

'চুরি!' সুজা বললো। 'পাগল নাকি লোকটা!'

'আমাকে পাগল বলে!' খেঁকিয়ে উঠলো শেরিফ। সহকারীদের বললো, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কী? হ্যাণ্ডকাফ লাগাও।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে দুই ভাই। হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো তাদের হাতে।

'অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছো, খোকাবাবুরা,' শেরিফ বললো। রুমাল দিয়ে মুছলো কপালের ঘাম। 'চলো, এখন গারদে কিছুদিন থাকলেই শিক্ষা হবে।' সহকারীদের দিকে ফিরলো আবার। 'এই, অমন বোবা হয়ে আছো কেন? কথা বলো, কথা বলো, হাসো। যাও এখান থেকে

লোককে দেখাও, দায়িত্ব পালন করতে পেরে কতো খুশি হয়েছি আমরা।'

'দায়িত্ব?' রেজা বললো। 'একে দায়িত্ব বলছেন আপনি, শেরিফ? এ-তো রীতিমতো জুলুম করছেন।'

'এই, চোপ রাও!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো শেরিফ।

কয়েক মিনিট পর ছোট পুলিশ স্টেশনে ঢোকানো হলো দুই ভাইকে। ওদের পকেটের সমস্ত জিনিস বের করে টেবিলে রাখার নির্দেশ দিলো শেরিফ। আঙুলের ছাপ নিতে বললো। ছেলেদের-কে বললো, 'পয়লা রাতে দেখেই বুঝেছি, তোমরা গোলমাল করবে।'

প্রথমে সুজার আঙুলের ছাপ নিলো একজন ডেপুটি। তারপর রেজার। শেষে হেসে বললো শেরিফকে, 'শেরিফ, একটু মজা করি, না?' বলতে বলতেই সুজার কালিমাখা আঙুল তুলে নিয়ে তার শার্টে ঘষে লাগিয়ে দিলো। হাসলো হা-হা করে।

শেরিফ আর তার আরেক ডেপুটিও হেসে উঠলো।

'শেরিফ,' রাগে কঠিন হয়ে গেছে রেজার চেহারা, 'এসব করার আগে কিছু প্রমাণ জোগাড় করা উচিত ছিলো আপনার। কার বাড়িতে চুরি করেছি আমরা?'

দাঁত বের করে হাসছে শেরিফ। 'প্রমাণ? নিশ্চয় আছে। তো, শালামিয়া, মিস জেরিমোর যে বাড়ি নেই, কি করে জানলে?'

'চিনিই না,' রাগে লাল হয়ে গেছে সুজার মুখ।

'অ, চেনো না। ঠিক আছে, বলে দিই, দেখো মনে পড়ে কিনা। মিস ডরোথি জেরিমোর। সানডে স্কুলের টিচার।'

মিস জেরিমোর যে বাড়িতে নেই, একথা জেনেই নিশ্চয় ঠিকানা দিয়েছে মেরিনা, ভাবলো রেজা। কিন্তু কেন একাজ করলো?

'মনে পড়ছে না?' জিভ দিয়ে ওপরের পাটির দাঁত পরিষ্কার করলো শেরিফ। 'বেশ ধরে নিলাম, চেনো না। কিন্তু অচেনা এক-জন লোকের বাড়িতে চুরি করে ঢুকেছিলে কেন? পাশের বাড়ির লোকে দেখে আমাকে ফোন করেছে।'

'আমাদের দাওয়াত করেছিলো ডিন মার্টের বোন মেরিনা। সে-ই ওই ঠিকানা দিয়েছিলো।'

দু'জনের পকেট থেকে বের করা জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো শেরিফ। ছোট একটা থলেতে ভরে রেখে দিলো ড্রয়ারে। আরেক-টা থলে বের করলো। সেটার মুখ খুলে ভেতরের জিনিসগুলো ঢেলে দিলো ডেস্কের ওপর। রূপার কতগুলো অ্যানটিক—ছুরি, চামচ, কাঁটাচামচ, এসব।

'এগুলো কি?' ভুরু নাচালো শেরিফ।

'কেন, চেনেন না?' সুজা বললো। 'ভদ্রলোকেরা ওগুলো দিয়ে খায়। আপনি দেখেননি নাকি জীবনে?'

ধক করে জ্বলে উঠলো শেরিফের চোখ। 'মুখ সামলে কথা বলবে!'

'কখনও দেখিনি ওগুলো,' রেজা বললো।

'হ্যাঁ, ঠিক। দেখোনি। আজ বিকেলের আগে দেখোনি, এই তো?'

'এইমাত্র দেখলাম। কোথায় পেয়েছেন?'

'চুরি করে নিয়ে গিয়ে যেখানে লুকিয়েছো। তোমাদের ভ্যানে।'

'ভ্যানের কাছেই তো যাইনি,' অবাক হলো সুজা। 'মিস জেরি-

যাও এখান থেকে

মোরের বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই তো আমাদের ধরলেন।'

'কে বললো?' মিটিমিটি হাসছে শেরিফ। 'ভ্যানে গিয়েছিলে। তোমাদের ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেছে। গ্যারেজে ঢুকতে দেখা গেছে। চুরির একটু পরেই। কোর্টে সাক্ষী দেবে ওরা।'

ব্যাপারটা বুঝে ফেললো রেজা আর সুজা। ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিলো ওদের জন্যে, বোকার মতো ধরা দিয়েছে। ওদেরকে কাঁটা ভেবে পথ থেকে সরাতে চাইছে কেউ, আর সেই লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শেরিফ।

টেবিলে পা তুলে দিলো সে। বুটের গোড়ালিতে সোনার পাত লাগানো। কে তাদের ভ্যানে আগুন লাগিয়েছিলো, সেটাও বুঝতে পারলো দুই ভাই। আরও বুঝলো, ভালো বিপদেই পড়েছে! ছাড়া পাওয়া কঠিন হবে। ওদের বাবা মিস্টার মুরাদও বাড়ি নেই, জরুরি কাজে নিউ ইয়র্ক গেছেন, দেখে এসেছে আসার সময়ই। তাঁর কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

'একটা ফোন করতে পারবো?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'কেন? কাকে? এ-শহরে বন্ধু? বেশ, থাকলে করো।'

'শেলি গার্ডনারকে করবো। নাম্বারটা বলবেন প্লিজ?'

হাসি চলে গেল শেরিফের মুখ থেকে। আবার কপাল মুছলো। 'লাভ হবে না। ইচ্ছে হলে করো, কিন্তু লাভ হবে না।'

পরের আধ ঘণ্টা হাজতের ছোট্ট পরিসরে পায়চারি করে কাটালো সুজা। রেজা চুপচাপ বসে রইলো মাদুরে।

অবশেষে এলো শেলি। তাকে হাজতে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়ে চলে গেল এক ডেপুটি।

'কি ব্যাপার ?' শেলি জানাতে চাইলো।

'আপনার সাহায্য দরকার,' রেজা বললো। 'এ-শহরে আর কারো ওপর ভরসা করতে পারছি না।'

'আমি কি করতে পারি ?'

'এখান থেকে বেরোতে সাহায্য করতে হবে আমাদের,' ফিস-ফিস করে বললো সুজা।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত দুই ভাইকে দেখলো শেলি। তারপর বললো, 'পালাতে ? ওসব সিনেমাতে সম্ভব, বাস্তবে নয়,' জোরে জোরে কথা বলছে সে। অফিস থেকে শেরিফের কানেও বোধহয় যাচ্ছে তার কথা। 'আইনের পক্ষে হলে সব করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু বেআইনি কিচ্ছু করবো না।'

শেলির দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো রেজা। ধীরে ধীরে বললো, 'আপনি পুরো ব্যাপারটা জানেন না। চুরির দায়ে ফাঁসানো হয়েছে আমাদেরকে।'

'চুরি করেছো, এটুকু শুনেছি। শেরিফ বললো, সাক্ষীও নাকি আছে।'

'নিশ্চয়ই,' ব্যঙ্গ ঝরলো সুজার কণ্ঠে, বিকৃত করে ফেললো চেহারা। 'আমাদের নাকি চুরি করে ঢুকতে দেখেছে, মেরিনা যে বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলো সে-বাড়িতে। তারপর আমাদের পথেই পাকড়াও করা হলো। অথচ চোরাই মাল নাকি পাওয়া গেছে আমাদের ভ্যানে। গ্যারেজে গেলাম কখন ? ওখানে যেতেও নাকি দেখা গেছে আমাদের।'

'ভেবেচিন্তে ফাঁদ পাতা হয়েছে,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রেজা।

'টোপ ফেললো মেরিনা। বোকা মাছের মতো টুক করে গিলে নিলাম আমরা। ছিহ্! অবাক লাগছে, একজন শেরিফ কি করে শয়তান লোকের সঙ্গে হাত মেলায়!'

'আমাদের শেরিফ? নাহ্, বিশ্বাস হচ্ছে না। কিছু কিছু ব্যাপারে ওর বদনাম যে নেই, তা নয়। কিন্তু এতোখানি নিচে নামবে না। পুলিশ অফিসার হিসেবে সুনামও আছে তার।'

'আপনিও বলছেন!' ঘামে ভেজা হাতের তালু প্যান্টে ডলে মুছলো রেজা।

'আমি আর কি বলবো? সাক্ষী যদি থাকেই, আদালতে জুরিরা সিদ্ধান্ত নেবে।'

'অ্যাক্সরেডের আদালত? বিচারে কি রায় হবে এখুনি বলে দিতে পারি। শেরিফ যেখানে চোর-ডাকাতের সঙ্গে হাত মেলায়, জজ আর জুরিরা কি বাদ থাকবে নাকি? সব এক গেলাসে পানি খায়।'

'শুধু বিচারের নামে প্রহসন হবে,' সুজা বললো। 'দয়া করে যদিও বা জেলে না ঢোকায়, শহর থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হবে আমাদের। আইন জারি করে দেবে, যাতে আর ঢুকতে না পারি।'

'কি মনে হয় আপনার? হ্যারি ব্যানার আছে এসবের পেছনে?'

চোখ সরু সরু হয়ে এলো শেলির। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'শেরিফ! শেরিফ!'

এগিয়ে এলো একজন ডেপুটি। 'কী?'

'তালা খুলুন।'

বেরিয়ে গেল শেলি।

যাও এখান থেকে

আবার তালা লাগিয়ে ডেপুটিও চলে গেল।

'শেলির সাহায্য তো পেলাম না,' সুজা বললো। 'এখন কি করি?'

'বুঝতে পারছি না,' আনমনে জবাব দিলো রেজা।

নয়

তিনপাশে ছাতলা পড়া দেয়াল, একপাশে মোটা লোহার গরাদ। বেরোনোর উপায় নেই। খাঁচায় বন্দী চিতার মতো পায়চারি করছে সুজা।

'চুপ করে বসো,' রেজা বললো। 'একটা উপায় বের করা দরকার।' কান পেতে শেরিফের ঘরে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে সে। শেলি কি চলে গেছে? শিকে গাল চেপে কান ফেরালো সেদিকে। বেশিক্ষণ থাকতে পারলো না ওভাবে। বড় একটা পোকা শিক বেয়ে এসে তার গালে উঠলো। সুড়সুড়ি লাগতে সরে এসে ঝাড়া দিয়ে ওটাকে ফেললো রেজা।

এই সময় শেরিফের কণ্ঠ শোনা গেল, সহকারীদের বলছে, 'এই, তোমরা বাড়ি চলে যাও। আমি আছি। ব্যাটাদের পাহারা দেবো।'

খুশি হয়েই চলে গেল ডেপুটিরা, তাদের কথাবার্তায়ই বোঝা

গেল।

আবার শোনা গেল শেরিফের গলা, 'তোমার নিশ্চয় তাড়াহুড়া নেই, শেলি?'

পোকার কথা ভুলে গিয়ে আবার শিকে গাল ঠেকালো রেজা। পাশে এসে দাঁড়ালো সুজা।

'না, কাফে বন্ধ করে দিয়ে এসেছি,' শেলি বললো। 'নিকুও বড় হয়েছে, একা থাকতে পারে।'

'খুব চালাক হয়েছে, ছেলেটা। বই পড়ে। চারদিকে নজর। ভালো পুলিশ অফিসার হতে পারবে।'

'বোধহয়।'

'কি বলবো, শেলি, অনেকদিন পর তোমার মতো একজন সুন্দরী-কে একা পেলাম,' মোলায়েম কণ্ঠে বললো শেরিফ। কথার শেষে ছোট্ট একটা হাসিও উপহার দিলো।

'থ্যাংক ইউ।'

'তোমার স্বামীকে কতো বলেছি—আল্লাহ্ তাকে বেহেশত নসীব করুন—তার মুখের ওপর বলেছি: রবার্ট, বৌ পেয়েছো বটে। তুমি লাকি।'

আস্তে ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখলো সুজা, ফিসফিসিয়ে বললো, 'নাটক শুরু হয়েছে!'

'শ্‌শ্‌শ্‌!'

'শেলি, আমার বয়েসও কম নয়, শহরের সেরা হ্যাণ্ডসাম তরুণও নই,' আবার বললো শেরিফ। 'আমাকে...'

'কেউই চিরকাল তরুণ থাকে না, জন,' বাধা দিয়ে বললো শেলি।

'সুন্দরও থাকে না। ওসব ভেবে দুঃখ পাওয়ার অর্থ নেই।'

'তবে,' শেলির কথায় খুশি হলো শেরিফ, 'আমি এখানে খুব দামি লোক, এটা বলতে পারো। এমন কিছু বন্ধু আছে আমার, যাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে অন্যদের এখানে থাকা না থাকা। কি বলছি বুঝতে পারছো?' অযথাই কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলো শেরিফ। 'শেলি, আমাদের বিয়ে হলে

'জন,' আবার বাধা দিলো শেলি, 'শুকনো মুখে এসব আলাপ জমে না। কাফেতে অনেকখানি আপেল পাই আছে, কফিও আছে। গিয়ে নিয়ে আসি?'

'সেকথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়!' হেহ্ হেহ্ হাসলো শেরিফ।

সামনের দরজা খোলা, বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। সুজা বললো, 'কী কাণ্ড! একটা মাত্র মানুষের ওপর যা-ও বা ভরসা করলাম···হুঁহু!'

চুপ করে রইলো রেজা। ভাবছে। কি করা যায়? শেলি সাহায্য না করলে আর কেউ কিছু করবে না এখানে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো শেলি।

আবার কান পাতলো দুই ভাই।

'বাহ্, দারুণ হয়েছে তো,' প্রশংসা করলো শেরিফের। 'তাজা আপেলের গন্ধ নষ্ট হয়নি।'

'কফি তো এখনো কালোই খাও, নাকি?' জিজ্ঞেস করলো শেলি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে রেখেছো। ·এহ্হে, বেশি তেতো। আরে না না, তোমার বানানোর বদনাম করছি না। আসলে ভালো জিনিস যাও এখান থেকে

না খেতে খেতে মুখই খারাপ হয়ে গেছে। দাও, বেশি করে চিনি দাও।'

'রান্নার বদনাম আমি একদম সইতে পারি না।'

'আরে, বললাম তো তোমার রান্নার বদনাম করছি না। কি জানি হয়েছে আমার জিভে। স্বাদ অন্যরকম লাগছে।'

'জন, ছেলেদুটোকে কি করবে?' হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল শেলি।

'জানি না,' মুখে খাবার নিয়ে কথা বলছে যেন শেরিফ। 'সেটা আমার ব্যাপার নয়।'

'তাহলে কে জানে? জুরিরা?'

'হ্যাঁ, অনেকটা...,' দ্বিধা করছে শেরিফ, 'অনেকটা সে-রকমই।'

'আরেকটু কফি দিই।'

কথা বলছে ওরা। খানিক পর পরই আরও পাই কিংবা কফি নিতে বলছে শেলি, দিচ্ছেও।

'যতোই খাচ্ছে, ব্যাটার কথা কেমন জড়িয়ে আসছে মনে হচ্ছে না?' সুজা বললো।

'হ্যাঁ, জিভ ভারি হয়ে গেলে যেমন হয়... রেজার কথা শেষ হলো না। তার আগেই অফিসে দুম্‌ম্‌ করে শব্দ হলো। মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে ভারি কিছু।

আওয়াজের রেশ মিলানোর আগেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে এলো শেলি। হাতে একগোছা চাবি। দ্রুতহাতে তালা খুলে দিয়ে বললো, 'জলদি বেরোও!'

প্রশ্ন পরে করা যাবে, আগে পালানো দরকার, রেজা আর সুজাও

সেটা বোঝে। দিলো দৌড় শেলির পিছু পিছু।

অফিস পেরোনোর সময় দেখলো, মেঝেতে পড়ে আছে শেরিফ।

বাইরে শেলির গাড়ি, একুশ বছরের পুরনো বিশাল এক সেডান।

'মাথা নিচু করে রাখো,' এঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে বললো শেলি। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবো?'

'ডিন মার্টের গ্যারেজে চলুন,' রেজা বললো। 'ভ্যান থেকে কয়েকটা জিনিস নিতে হবে। তারপর হ্যারি ব্যানারের র‍্যাঞ্চে। ট্যাংকারগুলো কোথায় যায়, দেখবোই আজ।'

গ্যারেজের সামনে কয়েক মিনিট থামলো শেলি। আবার ছেলে-দের তুলে নিয়ে ছুটলো শহরের বাইরে

'কি খাইয়েছিলেন?' রেজা জিজ্ঞেস করলো। 'ঘুমের বড়ি?'

'হ্যাঁ,' ডানে-বাঁয়ে ঘুরছে শেলির চঞ্চল চোখ, বার বার তাকাচ্ছে রিয়ারভিউ মিররের দিকে। 'প্রায়ই কাফেতে গিয়ে বিরক্ত করে আমাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি। ব্যানারের গোলাম ব্যাটা।'

'আর সহ্য করতে হবে না। আজ রাতের মধ্যেই কিছু একটা করে ফেলবো।'

যেখান থেকে ব্যানারের সীমানা শেষ হয়ে ন্যাশনাল পার্ক শুরু হয়েছে, সেখানে এনে গাড়ি রাখলো শেলি। নামলো দুই ভাই। র‍্যাঞ্চের সীমানায় ঢুকে গেছে একটা ব্যক্তিগত সড়ক। একপাশে বেড়া দিয়ে আলাদা করা হয়েছে দুটো জায়গাকে।

'কতোটা কি করতে পারবে, জানি না,' শেলি বললো। 'উইশ ইউ গুড লাক।'

'আপনারা কি করবেন? আপনি আর নিকু?' গাড়ির জানালায় যাও এখান থেকে

হাত রাখলো রেজা। 'শেরিফ জেগে উঠেই তো যাবে কাফেতে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো শেলি। 'আর যা-ই করি, পালিয়ে যাবো না। হয়তো অ্যারেস্ট করবে আমাকে। করুক। তবে বিনা লড়াইয়ে হাল ছাড়বো না, এটা জেনে রাখতে পারো।' আত্ম-বিশ্বাসের হাসি হাসলো।

'থ্যাংকস,' বলে সরে দাঁড়ালো রেজা। 'আজ অনেক উপকার করেছেন আমাদের।'

চলে যাচ্ছে শেলি। গাড়ির টেললাইট যতোক্ষণ দেখা গেল, দাঁড়িয়ে রইলো দু'জনে।

'এবার কী?' জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু কি করবো?'

'বিষাক্ত বর্জ্যের গাদাটা খুঁজে বের করতে হবে। ওটার জন্যেই মার খেয়েছি। ঠিক সময়ে ভুল জায়গায় চলে গিয়েছিলাম আমরা।'

'দূর, সেকথা তো জানি,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো সুজা। 'খুঁজতে হলে আর দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলো।'

'আমার বিশ্বাস, জায়গামতোই এসেছি আমরা। ডিন মার্টের মেসেজ মনে আছে?'

'বেড়ার কাছে খুঁজবে।'

'হ্যাঁ। এই তো বেড়া।'

টর্চ জ্বেলে বেড়ার ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো ওরা। দেখতে দেখতে যাবে। লোহার খুঁটিতে তারের জাল লাগিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে।

বাতাস নেই। রাতের বনকে জাগিয়ে রেখেছে নিশাচর জীবেরা। বেড়া, বন, পথের ওপর তীক্ষ্ণ চোখ রেখে এগোলো ওরা।

'কুত্তাগুলো যদি আসে?' বললো সুজা।

'এতদূরে না-ও আসতে পারে,' নিজেকে আশ্বস্ত করলো যেন রেজা।

কাঁচা রাস্তায় ট্যাংকারের বিশাল চাকার দাগ চোখে পড়লো।

'গাড়ি!' হঠাৎ বলে উঠলো সুজা। 'কার!'

থেমে গেল রেজা। সে শুনতে পাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলো, 'শিওর?'

'কসম!' বলে হাত ধরে টেনে ভাইকে একটা ঝোপের ধারে নিয়ে এলো সুজা। দু'জনে ঢুকলো ভেতরে।

সত্যিই বলেছে। ব্যানারের বাড়ির দিক থেকে আসছে গাড়িটা। সার্চলাইট লাগানো হয়েছে। একবার এদিকে একবার ওদিকে সরছে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। ঝোপের সামনে দিয়ে মেন রোডের দিকে চলে গেল গাড়িটা।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বেরিয়ে এলো দু'জনে। আবার এগোলো বেড়ার ধার দিয়ে, টায়ারের চিহ্ন ধরে ধরে। রেজার টর্চ বনের দিকে, সুজারটা পথের দিকে। দু'জনে দু'দিকে দেখে চলেছে।

দাঁড়িয়ে গেল রেজা। বললো, 'দেখো।'

সুজাও দেখলো। পোড়া কাঠ পড়ে আছে। চিনলো জায়গাটা। সেরাতে ওখানেই ক্যাম্প করেছিলো। ওদের জিনিসপত্র নেই, নিশ্চয় তুলে নিয়ে গেছে যারা পিটিয়েছিলো তারা।

'আশ্চর্য। সেদিন রাতে বেড়াটা দেখলাম না কেন?' রেজা বললো।

'কি জানি। হয়তো দেখতে চাইনি বলেই চোখে পড়েনি। ভাবিস্‌নি ব্যানারের জায়গার এতো কাছে ক্যাম্প করেছি।'

বেড়ার নিচের ফাঁক দিয়ে ক্রল করে ভেতরে ঢুকলো সুজা। রেজাও ঢুকলো। বেড়ার ধার দিয়ে সামনে এগোলো আরও কিছু দূর।

'সুজা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো রেজা। 'দেখ! টায়ারের দাগ এখানে।'

ডানে মোড় নিয়ে চলে গেছে পথ।

দাগ দেখতে দেখতে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো সুজা, 'এলো কোনদিক থেকে!'

দেখা গেল, দাগগুলো এসেছে ব্যানারের সীমানার ভেতর থেকে।

'বেড়া পেরোলো কিভাবে?' বেড়ার ওপর আলো ফেললো সুজা।

'নিশ্চয় খোলাটোলা আছে কোথাও।'

পাওয়া গেল অবশেষে। এমন ভাবে মিশিয়ে রাখা হয়েছে, ভালো করে না দেখলে চোখে পড়ে না। বেড়া কেটে দরজা তৈরি হয়েছে। আলগা। দু'দিক থেকে ধরে বিশেষ কায়দায় টানতেই খুলে চলে এলো বেড়ার একটা টুকরো।

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। দু'জনে একই কথা ভাবছে।

'এখান দিয়ে পার্কে ঢোকে ট্যাংকারগুলো,' মুখ খুললো রেজা। 'ব্যানারের সীমানার ভেতর দিয়ে।' গতি বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের,

জোরে জোরে লাফাচ্ছে।

দাগ ধরে ধরে পার্কের গভীরে ঢুকে গেল ওরা। প্রচণ্ড উত্তেজনা। প্রায় ছুটে চলেছে।

সামনে অদ্ভুত রূপ নিয়েছে বন। গাছগুলো যেন কেমন! বনের অন্য অংশের সঙ্গে মিল নেই। পাতা মরা, ছোট ছোট সব ডাল ঝরে গিয়ে শুধু কাণ্ডগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝোপ বেশির ভাগই মৃত, শুকনো। বাকিগুলো হলদেটে, মরে যাবে খুব তাড়াতাড়িই। অন্যান্য জায়গার মতো শুকনো, শক্ত নয় মাটি; নরম, ভেজা ভেজা।

টর্চের আলোয় একটা মৃতদেহ চোখে পড়লো। একটা, তারপর আরেকটা। মরে, পচে গেছে। দুটো র‍্যাকুন। খানিক দূরে মরা দুটো কাঠবেড়ালি দেখা গেল। আর কিছু পাখি।

পচা উদ্ভিদ আর জানোয়ারের তীব্র দুর্গন্ধ বাতাসে। সেই সঙ্গে মিশেছে আরেকটা বাজে গন্ধ। কোনটা যে বেশি প্রকট, বোঝা মুশকিল।

'আর এগোনোর দরকার নেই,' রেজা বললো।

'কিন্তু দাগ তো আরও এগিয়েছে।'

'যাক। আমরা আর যাচ্ছি না। ভয়ঙ্কর এলাকা। মারাত্মক। বলতে গেলে বিষের গাদার ওপরই এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।'

'তারমানে,' কঠিন কণ্ঠে বললো সুজা, 'নিজের জায়গায় বর্জ্য ফেলে না ব্যানার। পার্কে এনে ফেলে।'

জবাব না দিয়ে ঘুরলো রেজা। ফিরে চললো, যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে। পিছে চললো সুজা।

হঠাৎ দূরে গাছের ফাঁকে দেখা গেল হেডলাইট, শক্তিশালী ডিজেলএঞ্জিনের ভারি গর্জন কানে এলো।

ট্যাংকার।

•

দশ

'এখন কি হবে?' সুজার প্রশ্ন। কণ্ঠের ভয় চাপা দিতে পারলো না।

'বনে লুকিয়ে পড়বো। ওরা জানবেই না আমরা এসেছি।'

দ্রুত গাদার কাছ থেকে সরে এলো ওরা। ছুটে ঢুকে পড়লো পাশের বনে। ট্যাংকারগুলো আসছে ওদের দিকেই।

হঠাৎ ভাইয়ের হাত খামচে ধরলো সুজা। 'এই, বেড়া!'

'সর্বনাশ!' থমকে দাঁড়ালো রেজা। বেড়ার অংশটা সে খুলে রেখে এসেছে, মনেই নেই। 'দেখলেই বুঝে ফেলবে!'

আরেক দিকে ঘুরে আবার ছুটলো ওরা। ট্যাংকারগুলোর আগে পৌঁছতে হবে ওখানে। একটা সুবিধে, কাঁচা রাস্তায় নেমে গতি অনেক কমে গেছে ওগুলোর। ঝাঁকুনি খেতে খেতে আসছে, খুব ধীরে। মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঝিকিয়ে উঠছে হেড-লাইটের আলো।

গাড়িগুলোর আগেই পৌঁছলো দুই ভাই।

'কি ভাবে যেন লাগানো ছিলো?' রেজা বললো।

'মনে নেই। একভাগে লাগিয়ে রাখলেই হলো। অন্ধকারে কে খেয়াল করছে?'

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ওরা। দু'দিক থেকে ধরে আবার জায়গা মতো লাগিয়ে দিলো টুকরোটা।

'যাক, বাঁচা গেল।'

'ভাগ্যিস সময়মতো মনে পড়েছিলো। চল। গাদার কাছে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকি। ব্যাটারা কি করে দেখা দরকার। পুলিশকে বলতে হবে।'

'পুলিশকে বলে কিছু হবে না, ভালো করেই জানো,' বনের ভেতরে দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলতে চলতে বললো সুজা। 'পুলিশ মানেই তো শেরিফ জন মরিস। ও-ব্যাটাকে বললে উল্টো আমাদেরকেই হাজতে ভরবে।'

'সেটাই হলো সমস্যা। কোনোভাবে লটনে যেতে হবে আমাদের, জানাতে হবে ওখানকার পুলিশকে।'

গাদার কাছাকাছি লুকানো একটা জায়গা খুঁজে বের করলো রেজা। কাছেও নয়, আবার বেশি দূরেও নয় জায়গাটা। ভালো। এখানকার মাটিও নরম, তারমানে রাসায়নিক বর্জ্য এই মাটিকেও নষ্ট করেছে। চামড়ায় লাগলে ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই কয়েকটা বড় বড় পাথরের ওপর উঠে বসলো ওরা।

এলো রূপালি ট্যাংকারগুলো। আগে আগে রয়েছে একটা জীপ। পথের পাশে থেমে আগে বাড়ার জায়গা করে দিলো ভারি গাড়িগুলোকে।

জীপ থেকে নামলো হিপ বুট পরা একজন লোক। হেডলাইটের আলোয় তাকে চিনতে পারলো দুই ভাই।

'ব্যানার,' ফিসফিসিয়ে বললো সুজা। 'ব্যাটাকে ধাক্কা দিয়ে গাদায় ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'চুপ!'

প্রথম ট্যাংকারটাকে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত করলো ব্যানার।

ছোট্ট খোলা জায়গা পেরিয়ে বনের কিনারে দাঁড়ালো গাড়িটা। ড্রাইভার নেমে, বডিতে লাগিয়ে রাখা কুণ্ডলি পাকানো হোস পাইপ খুললো। টেনে নিয়ে গেল গাছপালার ভেতরে। ফিরে এসে ঘোরালো গোল একটা হ্যাণ্ডেল। ফুলে উঠলো চ্যাপ্টা হয়ে থাকা পাইপ!

তরল পদার্থ তোড়ে বেরোনোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রেজা আর সুজা।

'কি করে পারছে শয়তানটা?' সুজা বললো। 'এভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে গাছপালা জন্তুজানোয়ার! চিরকালের জন্যে ধ্বংস করে দিচ্ছে এলাকাটা।'

8

'যা করার তো করে ফেলেছে। আজই রুখতে হবে ওকে, আর বেশি যাতে করতে না পারে।'

বর্জ্য তরল ফেলে সরে এলো ট্যাংকারটা, আরেকটাকে জায়গা করে দিলো গ্যালন গ্যালন মারাত্মক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ঢালতে শুরু করলো ওটাও, হোস পাইপের সাহায্যে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে ব্যানার, আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে। তবে বেশি কিছু বলতে হচ্ছে না। ড্রাইভারদের জানাই আছে, কি করতে হবে। অনেক

দিন থেকেই করছে বোধহয়, অভিজ্ঞ।

এক এক করে পাঁচটা ট্যাংকারই বর্জ্য ঢালা শেষ করলো। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে এসে ব্যানারকে ঘিরে দাঁড়ালো ড্রাইভারেরা।

একসঙ্গে পাঁচটা এঞ্জিনের গর্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বড় বেশি নীরব মনে হলো এলাকাটাকে। প্রতিটি কথা স্পষ্ট কানে আসছে রেজা আর সুজার। ব্যানার বলছে, 'ওস্তাদ হয়ে গেছো তোমরা। একটুও ভুল হয় না।' পকেট থেকে নোটের মোটা একটা বাণ্ডিল বের করে গুণে কয়েকটা নিয়ে দিলো এক ড্রাইভারকে। তারপর আরেকজন-কে। 'যাক, এবারকার মতো শেষ হলো। ওই ছেলেদুটো চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো। কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে

'বস্,' বাধা দিয়ে বললো এক ড্রাইভার।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো ব্যানার। 'কিছু বলবে?' বদলে গেছে কণ্ঠস্বর, হাসি হাসি ভাব দূর হয়ে গেছে, বরফের মতো শীতল এখন, খসখসে।

উসখুস করছে ড্রাইভার। মাথা চুলকালো। 'না, তেমন কিছু না। বেড়াটা·

'কি হয়েছে বেড়ার?'

'কাল রাতেও ঠিক ছিলো। আজ দেখলাম উল্টো। নাকি কাল রাতেই লাগানোর সময়

'নাআ! কাল রাতে আমি লাগিয়েছি, নিজের হাতে। তুমি ঠিক দেখেছো তো?'

মাথা ঝাঁকালো ড্রাইভার।

'কার কাজ, আন্দাজ করতে পারছি,' বুটের মচমচ শব্দ তুলে

যাও এখান থেকে

জীপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ব্যানার। একটা ছোট ওআরলেস সেট বের করে সুইচ টিপলো। মুখের কাছে এনে জোরে জোরে বললো, শেরিফ। শেরিফ। হ্যারি ব্যানার বলছি।'

'শেরিফের অফিস থেকে বলছি,' জবাব এলো। 'বলুন।'

'কে?'

'রিড, স্যার। ডেপুটি রিড বান।'

'তোমার বস্‌কে দাও।'

'বস ঘুমোচ্ছে, স্যার।'

'জাগাও ওকে,' ধৈর্য হারাচ্ছে ব্যানার।

'সম্ভব নয়, স্যার। স্বাভাবিক ঘুম নয়, মানে, ইচ্ছে করে ঘুমাননি। ওষুধ-টুষুধ কিছু খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। নিজেই রয়ে গিয়েছিলো ডিউটিতে। সকাল সকাল বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলো আমাদের। আমি একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম, সেটা নিতে এসে দেখি এই অবস্থা।'

'ছেলেদুটো?'

'দেখি, স্যার। ধরুন।'

রেজা আর সুজার মনে হলো, দীর্ঘ এক যুগ পর ফিরে এলো ডেপুটি। উত্তেজিত কণ্ঠে জানালো, 'ওরা তো নেই, স্যার!'

জীপের গায়ে কিল মারলো ব্যানার। নিজেকে সামলালো অনেক কষ্টে। 'রিড, যা বলি মন দিয়ে শোনো।'

'বলুন, স্যার।'

'বলুন বললে হবে না। যা বলবো, প্রতিটি শব্দ মনে রাখতে হবে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তুমি একা না পারলে যাও এখান থেকে

তোমার কলিগকে ডেকে নিয়ে এসো।'

'আপনি বলুন, স্যার, আমি পারবো,' ডেপুটির কণ্ঠের অস্বস্তি যন্ত্রের স্পীকারেও ফুটলো। বোঝা গেল স্পষ্ট।

'প্রথমে, টম ডেনভার, মেল ব্রোন আর নীল হ্যামারের সংগে যোগাযোগ করবে। ওদের বলবে, বিশ মিনিটের মধ্যে যেন আমার র‍্যাঞ্চে আমার সাথে দেখা করে। তারপর, একটা পসীর ব্যবস্থা করো, আই মিন, আসল পসী, আগের দিনে শেরিফরা যেভাবে আসামী খুঁজে বের করতো। তুমি দলের নেতৃত্ব দেবে। এদিককার পুরো এলাকা চষে ফেলবে। যে ভাবেই পারো, খুঁজে বের করবে ছেলে দুটোকে। নিয়ে আসবে আমার কাছে। বুঝেছো? যাও, কাজ শুরু করো।'

এগারো

'এখুনি সরে যাওয়া দরকার আমাদের,' সুজা বললো। 'আজ রাতের মধ্যে।'

'যাবো তো, কিন্তু কোথায়? এই এলাকা ওদের বাড়ি, আর আমরা কিছুই চিনি না। ধরে ফেলবে। তাছাড়া ব্যানারের আছে কুত্তার দল। লেলিয়ে দিলে, মরেছি।'

'তা ঠিক। কিন্তু তাই বলে চুপ করে বসে থাকবো? লটনে যাওয়ার চেষ্টা তো অন্তত করতে পারি।'

'লটন অনেক দূর।'

আবার গর্জে উঠলো গাড়িগুলোর এঞ্জিন।

আগের মতোই জীপটা চললো আগে আগে, পেছনে ট্যাংকারের মিছিল।

দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের শব্দ। পার্কে এখন স্তব্ধ নীরবতা। আশেপাশে কোনো জন্তুজানোয়ার নেই, কেউ ডাকছে না, ভয়ে পালিয়েছে সব। শুধু একা বসে আছে রেজা আর সুজা।

'এভাবে বসে থেকে কি হবে?' সুজা বললো। 'কিছু একটা করা দরকার।'

'চল, লটনে যাওয়ারই চেষ্টা করি,' রেজা বললো। 'পারবো বলে মনে হয় না। তবু, দেখি।'

'রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। বেরোলেই ধরে ফেলবে।'

'না, তা যাবে না। একটাই পথ আছে। পাহাড় ডিঙানো।'

অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে চললো ওরা। টর্চ জ্বালতেও সাহস হচ্ছে না। পায়ের নিচে শুকনো ডাল পড়ে মট করে ভাঙছে। চমকে চমকে উঠছে ওরা।

পেছনে পড়লো দুর্গন্ধ। পাইন বনের নেশা ধরানো সুগন্ধ লাগছে এখন নাকে।

সুজা চলেছে আগে আগে। নীরবে হাঁটছে। শক্তি খরচ হওয়ার ভয়ে কথাও বলছে না। কিছুক্ষণ একনাগাড়ে চলার পর বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামলো। একটা গাছে হেলান দিলো রেজা, ঘামে ভিজে গেছে শার্ট।

কেঁপে উঠলো তার পাশে দাঁড়ানো সুজা। 'দলবল নিয়ে নিশ্চয় এতোক্ষণে চলে এসেছে ব্যানার। আমাদের খুঁজছে।'

'বোধহয়। একজন একজন করে আলাদা হয়ে এলে কাবু করে ফেলতে পারতাম।' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো রেজা। 'কিন্তু তা করবে না। কোনো ঝুঁকি নেবে না ব্যানার ...'

এঞ্জিনের শব্দ কানে আসতে থেমে গেল রেজা। বাঁয়ে গাছের ফাঁকে আলো দেখা গেল। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো দু'জনে, দেখার জন্যে। উঁচু জায়গায় রয়েছে ওরা। পঞ্চাশ গজ নিচে দুটো

গাড়ি, একটা জীপ, আরেকটা ভ্যান। আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়ক ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আসছে।

একটা টিলার বাঁকে হারিয়ে গেল টেললাইট। রেজা বললো, 'ব্যানার আর ব্রোন।'

'ভ্যানের ওপরে যন্ত্রটা দেখেছো?'

মাথা ঝোঁকালো রেজা। 'দেখেছি। মাইক্রোওয়েভ ডিশের মতো লাগলো। প্যারাবোলিক মাইক্রোফোন। সাংঘাতিক সেনসিটিভ, শক্তিশালী। শিকার খুঁজে বের করতে এর জুড়ি নেই…'

'জানি। চলো। আরও দূরে সরে যাই।'

বনের ভেতর দিয়ে চলেছে ওরা। ঘন ঝোপঝাড়। মুখে বাড়ি মারছে পাতা, হাতে-মুখে-গলায় চাবুকের মতো আঘাত হানছে সরু ডাল। শব্দ না করার অনেক চেষ্টা করছে ওরা, পারছে না, ডাল সরার সাঁৎ সাঁৎ আওয়াজ হয়েই যাচ্ছে। কখনও পা জড়িয়ে ধরে টানছে কাঁটালতা, ছাড়াতে অসুবিধেতো হচ্ছেই, সময়ও নষ্ট হচ্ছে।

পাতলা হয়ে এলো বন। সরু একটা পায়েচলা পথ পেয়ে গেল। হাঁপ ছাড়লো দু'জনে। গতি বাড়াতে পারলো।

অনেক দূর এসে, কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে গতি কমালো ওরা। যাক, কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত নিরাপদ।

কিন্তু ভুল বুঝতে পারলো শিগগিরই। যে পথ দিয়েই যায়, মনে হয় ঘুরে সামনে দিয়ে চলে আসে ব্যানার কিংবা ব্রোন। যেদিকেই ঘোরে ছেলেরা, খানিক পরেই পাশে কিংবা সামনে শুনতে পায় এঞ্জিনের শব্দ।

'এক জায়গায় ঘুরে মরছি না তো আমরা?' সুজার জিজ্ঞাসা।

'না। ওরা আমাদের ঘিরে চক্কর মারছে।'

হাঁটতে হাঁটতে বনের বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। সামনে খানিকটা খোলা সমতল জায়গা, তারপরে শুরু হয়েছে পাহাড়। দৌড় দিলেই পেরোতে পারে খোলা জায়গাটা, কিন্তু ওই সময়ে যদি এসে পড়ে শত্রুরা? তাই অপেক্ষা করলো। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল একটা গাড়ি। চলে গেল দূর দিয়ে। বোঝা গেল, পার্কের চারপাশে টহল দিচ্ছে দুটো গাড়ি। নিশ্চয় বনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে খুঁজছে আরও অনেক লোক মিলে।

গাড়িটা সরে যেতেই দৌড় দিলো দু'জনে। কোন দিকে তাকালো না। এক ছুটে খোলা জায়গা পেরিয়ে চলে এলো পর্বতের গোড়ায়। একটা মুহূর্তও নষ্ট করলো না, উঠতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে। ঢালটা সব জায়গায় একরকম নয়, কোথাও বেশি খাড়া, কোথাও অপেক্ষাকৃত ঢালু। পাথরের ছড়াছড়ি। পায়ের নিচে পড়লেই পিছলে যায়।

উঠেই চললো ওরা। ব্যথা হয়ে গেল পা আর পিঠ। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু থামলো না।

অবশেষে উঠে এলো এমন একটা জায়গায়, পসীরা দেখার আগেই যেখান থেকে পসীদের দেখতে পাবে ওরা।

চাঁদ মাঝ আকাশে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় আশপাশের বহুদূর চোখে পড়ে। কয়েক শো' ফুট ওপরের একটা মালভূমিতে রয়েছে ওরা।

'শুয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিলে কেমন হয়?' রেজা প্রস্তাব দিলো।

'আমিও সে-কথাই ভাবছিলাম। আর পারছি না।'

শক্ত পাথরের ওপরই চিত হয়ে শুয়ে পড়লো দু'জনে। বাতাস ঠাণ্ডা। আগুন নেই যে, শরীর গরম করবে। কিন্তু এতো বেশি ক্লান্ত, শীতের পরোয়াই করলো না। চোখ মুদে বিশ্রাম নিতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো বুঝতেই পারলো না।

বারো

আগে ঘুম ভাঙলো সুজার।

শান্ত সকাল, মালভূমিতে সাধারণত যে-রকম হয়। নিথর হয়ে আছে যেন প্রকৃতি। বাতাস স্তব্ধ। অদূরে টুঁইই টুঁইই করে ডাকছে কি এক নাম-না-জানা ছোট্ট পাখি। পুব দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে রঙিন সূর্য, সোনালি বর্শার মতো ছুটে আসছে যেন অগণিত আলোক-রশ্মি।

রেজা ঘুমিয়ে আছে। থাক। ডাকলো না সুজা। চেয়ে চেয়ে দেখছে অপরূপ প্রকৃতি। এই জিনিসই তো দেখতে এসেছিলো ওরা। কারও বাড়া ভাতে ছাই দিতে নয়। ইস্, ওদের সমস্ত মজা নষ্ট করে ছাড়লো ওই শয়তান ব্যানারটা।

হালকা বাতাস বইতে শুরু করলো। মুখে মোলায়েম পরশ লাগ-তেই চোখ মেলালো রেজা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো, 'হায়, হায়, সকাল হয়ে গেছে! টেরই পাইনি!'

'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

'খাবার নেই, পানি নেই। গায়ের বলও থাকবে না বেশিক্ষণ। সুজা, এই পর্বতই পেরোতে পারবো না আমরা। থাক তো লটনে যাওয়া। রোদের তেজও বেড়ে যাবে একটু পরেই।'

'যতোটা পারি আরকি। ব্যানার কি করছে? এতোক্ষণে তো এসে পড়ার কথা।'

'পাহাড় পেরিয়ে ওপাশে যেতে পারবো না। তার চেয়ে আরেক কাজ করা যাক। পর্বতের ওপর দিয়ে যতোটা পারি সরে যাই, পার্কের কাছ থেকে দূরে। তারপর নেমে চলে যাবো অ্যাক্সব্রেডে। কোনো রকমে একটা গাড়ি জোগাড় করে...'

'হ্যাঁ, এই বুদ্ধিটা মন্দ না। চলো।'

মালভূমি থেকে নেমেই একটা পায়ে চলা পথ আবিষ্কার করলো ওরা। তারমানে এখানেও আসে লোকে। সেটা ধরে এগিয়ে চললো। পথ কোথাও সরু, কোথাও চওড়া, কোথাও গেছে ঢালের ওপর দিয়ে, কোথাও খাড়াই—বিপজ্জনক, পা ফসকালেই কয়েক শো ফুট নিচে। ছাতু হয়ে যাবে একেবারে।

সামনে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল পথ। ভূমিকম্পে পাথরের ধস নেমেছিলো বোধহয়, পাহাড়ের গায়ে মস্ত এক ফাটল, প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর। আর এগোনোর উপায় নেই। নামতে হলে এখানে, এই ফাটলের ধার ঘেঁষেই নামতে হবে। পর্বতের গোড়ায় পাছপালা নেই, পাথর আর ধুধু বালি।

নামতে শুরু করলো ওরা, এই সময় কানে এলো একটা বিচিত্র 'হুপ-হুপ-হুপ' শব্দ।

ঝট করে একসঙ্গে মুখ তুললো দু'জনে। আকাশের দিকে

তাকালো।

'কপ্টার!' বিড়বিড় করলো রেজা।

বাড়ছে শব্দটা। পাহাড়ের ওপাশ থেকে উড়ে এলো হেলিকপ্টার। এসেই দেখে ফেললো। সোজা ছুটে এলো ওদের দিকে। মাথার ওপর এসে নামতে শুরু করলো। রোটর ব্লেডের প্রচণ্ড বাতাস ঝাপটা দিয়ে যেন ফেলে দেবে দু'জনকে, চারপাশে ধুলোর ঘূর্ণি। কাত হয়ে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে কোনোমতে খাড়া রইলো ওরা।

হেলিকপ্টারের পেটে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে: পুলিশ।

সম্মোহিতের মতো ওটার দিকে তাকিয়ে আছে দুই ভাই। নড়ার কথা ভুলে গেছে যেন, ক্ষমতাই বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

আতংকিত চোখে সুজা দেখলো, কপ্টারের দরজা খুলছে। একজন মানুষ দেখা গেল, হাতে পিস্তল।

'সুজা, জলদি!' বলেই বসে পড়লো রেজা। পিছলে নামলো কয়েক ফুট। বড় একটা পাথরের চাঙড় লক্ষ্য। সড়াৎ করে নেমে চলে এলো ওটার কাছে, প্রায় ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে আড়ালে লুকালো।

পরক্ষণেই পাশে এসে পড়লো সুজা।

রোটরের শব্দ ছাপিয়ে টাশ্‌শ্‌ করে উঠলো পিস্তল। ঠিক সুজার মুখের কাছে পাথরের চলটা উঠে গেল গুলি লেগে।

আবার গুলির শব্দ হলো। আরেকটা বুলেট এসে লাগলো রেজার পায়ের কাছে।

আরেকবার শব্দ, এবার অন্যরকম। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওরা, লাল মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ছে কি যেন।

'ক্লেয়ার !' রেজা বললো। 'আমাদের এখানে আটকে রেখে ক্লেয়ার ছুঁড়েছে। ব্যানারকে জানাচ্ছে, আমাদের পেয়ে গেছে।'

দাঁড়াতে গেল সুজা, সঙ্গে সঙ্গে গুলি হলো। ফুটখানেক দূরে পাথরের চলটা উঠলো আবার। বসে পড়তে বাধ্য হলো সে।

পাশ দিয়ে মুখ বের করে নিচে তাকালো রেজা। বললো, 'আমাদের দৌড়াদৌড়ি খতম। ওই দেখো।'

আরেক পাশ দিয়ে মুখ বের করে সুজাও দেখলো। পর্বতের গোড়ার কাছে ছুটে আসছে কুকুরগুলো, পেছনে ব্যানার। ইতিমধ্যেই ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে ব্রোন আর ডেনভার।

বিশাল এক ফড়িঙের মতো ঝুলে রয়েছে যেন কপ্টারটা। যাচ্ছে না। ওরা ওঠার চেষ্টা করলেই গুলি চালাচ্ছে। উদ্দেশ্য বোঝা গেল, মারতে চায় না। আটকে রেখেছে।

পেছন থেকে গড়িয়ে নেমে এলো অনেকগুলো পাথর।

ফিরে তাকালো সুজা।

ওপাশ দিয়ে উঠে নেমে আসছে একজন মানুষ, তার পায়ে লেগে পাথরগুলো পড়েছে। নীল হ্যামার।

'কী, আর দৌড়াচ্ছো না কেন?' কাছে এসে বিজয়ীর হাসি হাসলো হ্যামার। হাতের দড়িটা নাচালো শপাং করে। আরেক হাতে বালি ঝাড়লো শার্ট আর প্যান্টের। 'ওঠো। মিস্টার ব্যানার অস্থির হয়ে আছেন।'

'ধরে লাগানো যায় না কয়েকটা?' ভাইয়ের দিকে তাকালো সুজা।

রেজা জবাব দেয়ার আগেই হ্যামার বলে উঠলো, 'দেখো চেষ্টা যাও এখান থেকে

করে। খামোকা পাহাড় থেকে পড়ে ঘাড় ভাঙবে আরকি। তার চেয়ে শান্ত ছেলের মতো চলো। মিস্টার ব্যানার কয়েকটা কথা বলেই ছেড়ে দেবেন।' নোংরা দাঁত বের করে হাসলো সে। মাথা নেড়ে নিচে নামার ইঙ্গিত করলো।

আর কিছু করার নেই। বাধ্য ছেলের মতো উঠে দাঁড়ালো দু'-জনে। নামতে শুরু করলো।

ওদেরকে নিয়ে পর্বতের গোড়ায় নেমে এলো হ্যামার, ব্রোন আর ডেনভার।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্যানার। পাশের কাছে সারি দিয়ে বসেছে কুকুরগুলো। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, আর কড়া চোখে দেখছে বন্দিদেরকে। হুকুম পেলেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার জন্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'ধরা তো পড়লো,' বললো ব্রোন। 'কি করা? হাজতে ভরবে?'

ব্রোনের কথার জবাব দিলো না ব্যানার। তাকালোও না তার দিকে। এমন ভাব করছে, যেন আশেপাশে আর কারও অস্তিত্বই নেই, শুধু সে নিজে, রেজা এবং সুজা ছাড়া। শান্ত কণ্ঠে বললো, 'যখন কিছু জানতে না, তখনই ভাবিয়ে তুলেছিলে। আর এখন তো সবকিছুই জেনে গেছো।'

'কি জানি?' ভাব করলো সুজা, যেন কিছু জানে না।

'গাদার কথা জানো। ওখানে তোমাদের পায়ের ছাপ পেয়েছি. আরও অনেক চিহ্ন,' আস্তে মাথা নাড়লো ব্যানার। দামি কার্পেটে বিস্কুটের গুঁড়ো ফেলায় দুষ্টু নাতিকে শাসন করছে যেন ধৈর্যশীল দাদা। হঠাৎ বদলে গেল কণ্ঠস্বর; কঠোর, খসখসে হয়ে গেল, 'দূরে যাও এখান থেকে

আনো ওদের,' হ্যামার আর ডেনভারকে আদেশ দিলো সে।

সেজার পিঠে ধাক্কা মারলো হ্যামার, আগে বাড়ার জন্যে।

'এক মিনিট,' ব্রোন হাত তুললো। 'তুমি বলেছিলে, ধরে শেরিফের হাতে তুলে দেবে।'

'দেখো, মেল,' কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকালো ব্যানার, 'এখনিতেই অনেক ঝামেলায় আছি, আর বাড়িও না।' তরুণ র‍্যাঞ্চারের মুখোমুখি হলো। 'বুঝতে পারছো না নাকি? ওদের যেতে দিতে পারি না আমরা। গিয়ে বলে দেবে গাধার কথা! পার্কে বর্জ্য ফেলছি সেকথা লটনের পুলিশ জানলে কি হবে ভাবো। কোনো উপায় নেই, মেল, ওদের মরতেই হচ্ছে।'

'হ্যারি,' গলা কাঁপছে ব্রোনের। তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে হ্যামার, ডেনভার আর ব্যানার, যেন সে-ই ওদের শত্রু। 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কথা বলছো!'

'না করলে চোদ্দ বছর গিয়ে নরকবাস করে আসতে হবে আমাদের। অতোদিন জেলে কাটানোর কথা ভাবতেই পারছি না আমি,' ব্যানারের কণ্ঠ শান্ত, কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে হুমকির লক্ষণ স্পষ্ট। দরকার হলে ব্রোনকেও ছাড়া হবে না, সেকথাই বুঝিয়ে দিতে চাইছে।

পিছিয়ে এসে পায়চারি শুরু করলো ব্রোন। ভয়ে ভয়ে বললো, 'উপায় নিশ্চয় আছে। এক কাজ করলেই হয়। কিছু টাকা দিয়ে দাও ওদের, মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। টাকা কে না ভালোবাসে?'

চারপাশে তাকালো রেজা আর সুজা। বুনো অঞ্চল। ওদেরকে ঘিরেছে এমন চারজন মানুষ, যারা আইনের পরোয়া করে না। নিজের স্বার্থহানী ঘটার উপক্রম দেখলে খুন করতেও পিছপা নয়।

যাও এখান থেকে

পায়চারি থামিয়েছে ব্রোন। তার পাশে এসে দাঁড়ালো ডেনভার। চোখের সানগ্লাস খুলে হাতে নিলো। চশমা চোখে না থাকলে কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয় তাকে। 'মিস্টার ব্যানার, এই দুটোর জন্যে বিন্দুমাত্র দরদ নেই আমার। কিন্তু মানুষের খুনেও হাত রাঙাতে চাই না আমি।'

নীল হ্যামারের দিকে তাকালো ব্যানার। 'তুমি?'

'আপনি যা করতে বলবেন, মিস্টার ব্যানার,' রায় দিয়ে দিলো কাউবয়, কিন্তু গলায় জোর নেই।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবে ভাবলো ব্যানার। 'ওকে,' হেসে মাথা নাড়লো অবশেষে। ঢিল করে দিলো কাঁধ। 'অন্য ব্যবস্থাই করতে হবে।'

ব্রোনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, 'গুড।'

স্বস্তি বোধ করলো আরও তিনজন, রেজা, সুজা, এবং ডেনভার।

'তবে ছেলেগুলোকে এখনি ছাড়া যাবে না,' ব্যানার বললো। 'আজরাতে শেষ ডেলিভারিটা হয়ে যাক, তারপর। ততোক্ষণ আমার বেসমেন্টে আটকে রাখবো ওদের। কাল দেখি কি করা যায়।'

ব্রোনের ভ্যানে তোলা হলো দুই ভাইকে। ব্যানারের সঙ্গে জীপে উঠলো হ্যামার। ভ্যানের পেছনে একটা স্যাডলে বসলো ডেনভার, যাতে রেজা-সুজার ওপর চোখ রাখতে পারে। হাতে একটা রেঞ্জ, দুই ভাইয়ের প্রতি নীরব হুমকি।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললো না। অবশেষে ব্রোন বললো, 'এই মিয়ারা, চুপ করে আছো কেন?'

'কি বলবো ?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'মাপ চাও। বলো, শহর থেকে চলে না গিয়ে ভুল করেছিলে। বলো, এবার ছেড়ে দিলে আর এক মুহূর্ত দেরি করবে না, কাউকে কিচ্ছু বলবে না। বলো যে, আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছি বলে আমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'তারচে আপনি বলুন তো,' রেজা বললো, 'এই সুন্দর জায়গাটা নষ্ট করছেন কোন প্রাণে ? লক্ষ লক্ষ গ্যালন বিষ ঢেলে বাপ-দাদার জায়গা নষ্ট করতে একটুও কষ্ট হয় না আপনার ?'

'চুউপ !' চেঁচিয়ে উঠলো ব্রোন। আড়চোখে ডেনভারের দিকে তাকালো।

আবার নীরবতা।

ব্যানারের ড্রাইভওয়েতে ঢুকে ভ্যান থামালো ব্রোন। পেছনে থামলো জীপটা।

রেজা আর সুজাকে নামানো হলো। এই সময় বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক মহিলা।

'আফটারনুন, মিসেস ব্যানার।' ডেনভার বললো।

ছোটখাটো মানুষ মিসেস ব্যানার। ধূসর কোঁকড়া চুল। উজ্জ্বল রঙের একটা ছাপা পোশাক পরেছে, বড় বড় ফুল। পায়ে শাদা মোজা আর স্লিপার। ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলো।

মহিলা কি জানে তার স্বামী কি করছে ?—ভাবলো রেজা। না বোধহয়। চোখ দেখে তো কিছু মনে হচ্ছে না। দু'জন তরুণকে বেসমেন্টে আটকে রাখার জন্যে কি কৈফিয়ত দেবে ব্যানার ? আশার আলো ঝিলিক দিলো তার মনে : মহিলা তাদের পালাতে

সাহায্য করবে, হয়তো !

'খিদে লেগেছে ?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো মহিলা।

'লেগেছে। পরে খাবো। আগে কাজ শেষ করি।'

'আমাকে কিছু করতে হবে ?'

'না। বেসমেন্টে এ'দুটোকে আটকে রাখবো।'

'সেখানেই ভালো হবে। বেঁধে ফেলে রাখলে পালাতে পারবে না। চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।'

দমে গেল রেজা। নিরাশ করলো তাকে মহিলা। যা করার ওদের দু'জনকেই করতে হবে। বাইরের সাহায্যের কোনো আশা নেই।

বেসমেন্টে নিয়ে আসা হলো দু'জনকে। দ্রুত ঘরটায় চোখ বোলালো ওরা। দুর্বল জায়গা কোথায় ? যেখান দিয়ে বেরোনো যেতে পারে ? কংক্রিটের মেঝে, শক্ত কাঠের দেয়াল। ঘরটা বেশ বড়, কয়েক ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে রয়েছে ব্যানারের অফিস—বোধহয় গোপন অফিস, একটা ডেস্ক, টেলিফোন আর কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট। আরেকটা অংশকে স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা হয়, গাদাগাদি করে ফেলে রাখা হয়েছে পুরনো, ভাঙা আসবাব-পত্র। ওগুলোর ভেতর থেকে উঁচু পিঠওয়ালা, ওক কাঠের ভারি দুটো চেয়ার বের করে আনলো ব্যানার। দুই ভাইকে বসিয়ে, দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো চেয়ারের সঙ্গে। ডেনভার আর হ্যামার সাহায্য করলো তাকে। ব্রোন পায়চারি করছে।

বরফ দেয়া তিন কাপ ঠাণ্ডা চা নিয়ে এলো মিসেস ব্যানার। দুটো কাপে পাইপ। একটা কাপ স্বামীকে দিয়ে অন্য দুটো রাখলো রেজা আর সুজার সামনে। ওদের হাত বাঁধা, পাইপ মুখে লাগিয়ে

দিতে হলো। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে, বুকের ভেতরটা যেন মরুভূমি, সঙ্গে সঙ্গে টানতে শুরু করলো সুজা। রেজাও তাই করলো।

'কাল তাহলে ব্যবস্থা হচ্ছে?' ব্যানারের দিকে চেয়ে বললো ব্রোন।

'হ্যাঁ। কাল সকালে এখানে চলে এসো।'

দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল হ্যামার আর ডেনভার। পেছনে গেল ব্রোন। যাওয়ার ভঙ্গি আর বার বার ফিরে তাকানো দেখেই বোঝা গেল নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে, ব্যানারের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

ওরা চলে যাওয়ার পর পরই হাসি মুছে গেল মিসেস ব্যানারের মুখ থেকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'ওদের কেন এনেছো, হ্যারি?'

'ব্রোন আর ডেনভার বাধা দিচ্ছিলো।'

'খুন করতে' কথাটা উহ্য রাখলো ব্যানার। মোচড় দিয়ে উঠলো রেজার পেট। তাড়াতাড়ি টেনে দুই ঢোক ঢা গিললো।

'আজকালকার ছেলেছোকরাদের নিয়ে এই এক বিপদ,' মাথা নাড়লো মিসেস ব্যানার। 'শুরু করে, কিন্তু শেষ করতে পারে না।'

'যা করার আমাকেই করতে হবে মনে হচ্ছে। হ্যামারকেও বিশ্বাস নেই। ফ্লেকমেল শুরু করবে শেষে।'

প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো দুই ভাই।

'আমাদের খুন করে সামাল দিতে পারবে না!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। 'লোকে জেনে যাবেই।'

ওদের কথায় কান না দিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো মিসেস,

'কখন করবে ?'

'আজ রাতেই। পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলে দেবো। কাল সকালে ব্রোনকে বলবো, রাতে পালিয়েছে ওরা। আবার খোঁজা শুরু হবে। গিয়ে পাবে ভাঙাচোরা লাশ। ভাববে, পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে মরেছে। অমন কতো লোকই তো মরে।'

'মনে হচ্ছে, এসব ব্যাপারে বেশ হাত পাকিয়েছো। রবার্ট গার্ডনারকেও কি তুমিই ঠেলে ফেলেছিলে ?'

সরু হয়ে এলো ব্যানারের চোখের পাতা। 'কথাটা বলে আরও বোকামি করলে, ছেলে। সেদিন রাতে পার্কে পিটুনি খাওয়ার পরই পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো তোমাদের। তা না করে রবার্টের মতোই খুঁতখুঁত শুরু করলে, খোঁজখবর নিলে··· ভুল করেছো। তোমাদেরকেও তার মতোই মরতে হচ্ছে, সরি।'

'শেলি জানে, তার স্বামীকে যে খুন করেছো। আমাদের কথাও জানবে। এসব করে বাঁচতে পারবে না তুমি, ব্যানার।'

'খুব পারবো,' হাসলো ব্যানার। 'এ-শহরে আমার চুলের ডগাও ছুঁতে পারবে না কেউ। করলে কি পরিণতি হবে, জানে সবাই।' আঙুল মটকালো সে।

'সবাই নীল হ্যামার নয়। রবার্ট গার্ডনার এখনও দু'একজন আছে,' সুজা বললো।

'হ্যাঁ, তা থাকতে পারে, অস্বীকার করছি না। ওরা কচুটাও করতে পারবে না আমার। রবার্ট ভেবেছিলো, তার একটা কাফে আছে, আমার কাছে কোনো কিছুই বাঁধা নয়। সুযোগ পেলেই মোটর-

সাইকেল নিয়ে ঘুরতো,' মোলায়েম হাসি হাসলো ব্যানার। 'কিন্তু জানতো না, মোটর সাইকেল জিনিসটা বিপজ্জনক। অনেক অজায়-গায় নিয়ে যায়।'

'মানে?' রেজার প্রশ্ন।

'ঘুরতে ঘুরতেই গিয়ে আমার গাদা আবিষ্কার করে ফেলেছিলো। মাটিতে চাকার দাগ দেখেছি আমি।'

কথা এখানেই শেষ করে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো ব্যানার। পেছনে গেল তার স্ত্রী। সিঁড়ির মাথায় উঠে আলো নিভিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো দরজা।

জানালা নেই। বেসমেন্টে গাঢ় অন্ধকার। পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না রেজা আর সুজা, ঘরের কিছুই চোখে পড়ছে না। হাতে-পায়ে বাঁধা দড়িও নয়।

'কি করা যায়?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'চেয়ারগুলো কাছাকাছি আনা যায় কিনা দেখি শুরু কর।'

বসে থেকেই সামনে-পেছনে চেয়ার ঝাঁকাতে শুরু করলো রেজা। সুজাও। কিন্তু ভারি ওক কাঠের চেয়ার, আর এমনভাবে বেঁধেছে ওদের, নড়ানো কঠিন হলো।

প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করে বড়জোর ইঞ্চিখানেক কাছাকাছি হলো ওরা। অন্ধকার ওদের বড় শত্রু এখন।

'নাহ্, পারবো না,' হাল ছেড়ে দিলো সুজা।

'পারতেই হবে। নইলে মরবো।'

আবার শুরু হলো চেষ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে কাছাকাছি হলো ওরা, দুটো চেয়ারের মাঝে এখন মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফাঁক

আরও কাছে আসতে হবে, নইলে একজন আরেকজনের বাঁধনের গিঁট নাগাল পাবে না।

ঠিক এই সময় আলো জ্বললো। বরফের মতো জমে গেল দু'-জনে। নিশ্চয় ব্যানার আসছে। এসে দেখে ফেললে এতো কষ্ট বৃথা যাবে।

কার্পেট বিছানো সিঁড়িতে পদশব্দ, ধীরে ধীরে নামছে।

দম বন্ধ করে রেখেছে সুজা। স্লিপার আর মোজা চোখে পড়লো। শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো ওদের দিকে মিসেস ব্যানার। বললো, 'না না, ভরসার কিছু নেই, তোমাদের ছাড়াতে আসিনি।' ফ্রিজের দিকে এগোলো সে। রান্নার জন্যে মাংস বের করে নিয়ে চলে গেল। দু'জনের চেয়ার যে কাছাকাছি হয়ে গেছে, খেয়াল করলো না। কপাল ভালো ওদের।

আরও একটা কাজ করে গেল মিসেস, ওদের সহায় হলো সেটা, আলো জ্বেলে রেখেই চলে গেল। বোধহয় নেভাতে মনে নেই।

আঙুল টান টান করে রেজার বাঁধন ধরার চেষ্টা চালালো সুজা। ছুঁতেই পারলো না। ছোঁয়া গেলেও লাভ নেই। এক হাতে খুলতে পারবে না, দু'হাত লাগবে।

'ওভাবে পারবি না,' রেজা বললো। 'আমার পকেটে ছুরি আছে। দেখ, বের করতে পারিস কিনা।'

প্যান্টের পকেটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়েই আছে ছুরির বাঁট। চেষ্টা করলে বের করে নেয়া সম্ভব।

ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আবার চেয়ার সরাতে শুরু করলো সুজা। রেজাও সরালো। দু'জনের চেষ্টায় সুজার আঙুলের কাছে চলে যাও এখান থেকে

এলো রেজার পকেট, ছুরির বাঁটটা ছুঁতে পারলো।

'ধরেছি!' আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সুজা।

'খবরদার, ফেলিস না!'

সুইচ টিপলেই ফলাটা খুলে যায়। খোলার চেষ্টা করলো সুজা, আবার শোনা গেল পায়ের আওয়াজ।

নেমে এলো ব্যানার। চেয়ার যে কাছাকাছি হয়েছে, সে ঠিকই লক্ষ্য করলো। 'বা-বা, কি কাণ্ড! কাছাকাছি হলে কিভাবে? ভূতে তুলে এনে রেখেছে নাকি?' দাঁত বের করে হাসলো সে। পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলো দুটো চেয়ার।

বেমক্কা ভাবে মেঝেতে পড়ে ভীষণ ব্যথা পেলো দু'জনেই।

'যাক, কিছুটা শিক্ষা হলো,' বললো ব্যানার। 'ভাবলাম, দেখে যাই কেমন আছো। ঠিকই করেছি।'

চলে যাচ্ছে ব্যানার। সুজা ডেকে বললো, 'ব্যানার, এজন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে।'

'তাই নাকি?' খিকখিক করে হাসলো ব্যানার। 'বেশ, রাতে ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে কে পস্তায়।' আবার বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল সে।

কয়েক সেকেণ্ড বিষণ্ণ নীরবতা।

'ছুরিটা আছে হাতে?' জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'আছে। দেখো, চেয়ারটা আমার হাতের কাছে আনতে পারো কিনা।'

অনেক চেষ্টা আর পরিশ্রমের পর প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করলো রেজা। কিন্তু কাটার চেষ্টা করতে গিয়ে হাত থেকে ছুরি ফেলে

দিলো সুজা। তবে কাত হয়ে পড়ে থাকায় মেঝের কাছাকাছিই রয়েছে হাত, ছুরিটা তুলতে পারলো আবার। তারপর দ্বিতীয়বার ফেললো। আবার তুললো।

টানাটানিতে কব্জিতে কেটে বসলো দড়ি, চামড়া ছড়ে গেল। এক ইঞ্চি চামড়ার বিনিময়ে এক ইঞ্চি আগে বাড়লো হাত, মস্ত সুবিধে। এবং এর ফলে রেজার দড়ির একটা জায়গা কাটতে পারলো সুজা।

অনেক কাজ হলো তাতেই।

কয়েক মিনিটেই বাঁধনমুক্ত হলো দু'জনে। হাত-পা ঝাঁকিয়ে, ডলে, রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলো। সিঁড়িতে উঠে আলো জ্বেলে দিলো রেজা। ঘড়ি দেখে বললো, 'ইস্, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতোক্ষণে নিশ্চয় বর্জ্য ফেলতে চলে গেছে ব্যানার। আমাদেরও যেতে হবে।'

জবাব দিলো না সুজা। তাকিয়ে আছে ঘরের কোণে ছোট একটা টুলে রাখা একটা পুরনো ওয়্যারলেস সেটের দিকে। ধুলোয় মাখামাখি। আনমনে বিড়বিড় করলো, 'চালু হবে?'

'কার সঙ্গে কথা বলবি?'

'নিকু।'

'অ্যাঁ? ঠিক। ওটার সাহায্যেই যখন ট্যাংকারগুলোকে ফলো করে, আমাদের কপাল ভালো হলে আজও করতে পারে। দেখ চেষ্টা করে।'

সিঁড়ির ওপরে উঠে বন্ধ দরজায় কান পাতলো সুজা। টেলিভিসনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয় টিভি দেখছে মিসেস ব্যানার।

ওয়্যারলেসে কথা বললে শুনতে পাবে না।

প্লাগ লাগিয়ে সুইচ টিপলো রেজা। চালু হলো যন্ত্রটা। ঠিকই আছে। নিশ্চয় মাঝেসাঝে ব্যবহার করে ব্যানার। মাইক্রোফোন তুলে বললো, 'হারলে-ডেভিডসন বলছি, হারলে-ডেভিডসন, পুরনো মোটর সাইকেল বিক্রেতা। নিকু নামের একটা ছেলেকে খুঁজছি। কোনো সহৃদয় ভদ্রলোক আমার কথা শুনতে পেলে দয়া করে তাকে বলবেন, আমি চ্যানেল চোদ্দতে লাইন খোলা রেখেছি।'

বিরতি দিয়ে দিয়ে কয়েকবার একই কথা বললো রেজা। জবাব নেই। নিরাশ হয়ে যখন ভাবলো, জবাব আর আসবে না, তখনই এলো সাড়া। কথা বললো নিকু স্বয়ং। 'হারলে-ডেভিডসনকে খুঁজছি। হারলে-ডেভিডসন।'

'বলছি।'

'কে?'

'কেন, মোটর সাইকেলটার কথা ভুলে গেছো? উনিশ শো পঁয়ষট্টি মডেল একটা হারলে স্পোর্টসস্টার মেরামত করেছিলাম। ভুলে গেছো?' সুজার দিকে তাকালো রেজা। দু'জনের মনে একই জিজ্ঞাসা, গলা চিনতে পারবে তো নিকু? ইচ্ছে করেই কণ্ঠস্বর বদলে কথা বলছে রেজা, যাতে ব্যানার শুনলেও সহজে চিনতে না পারে।

'চিনেছি, মিস্টার হারলে-ডেভিডসন!'

'একটা সমস্যায় পড়েছি। সাহায্য দরকার।'

'কী সাহায্য।'

'মনে করো, একটা অঙ্ক। সময়, এবং জায়গার। কিছু লোককে

নিয়ে ঠিক সময়ে একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছতে হবে।'

'সময় আর দূরত্বের কথা বলছেন না তো?'

'ঠিক ধরেছো। এই কাজের জন্যেই বেরিয়েছিলাম আজ রাতে। তোমার বাড়ি থেকে নয় মাইল পশ্চিমে, তিন মাইল দক্ষিণে একটা জায়গায় কিছু লোককে নিয়ে পৌঁছতে হবে। কতো সময় লাগবে?'

'লোকগুলো কোত্থেকে আসছে, না জানলে কি করে বলি? কাছে থেকে? নাকি দূরে থেকে?'

'দূরেই ধরো। পরের শহর থেকে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো নিকু,'ক'টার সময় পৌঁছা দরকার?'

'মাঝরাত। সময় মতো পারবে?'

নিকুর জবাব আর শোনা হলো না। দরজা খোলার শব্দ। যন্ত্রের সুইচ অফ করে, একটানে সকেট থেকে প্লাগটা খুলে প্রায় ছুটে গিয়ে সিঁড়ির নিচে ঢুকলো রেজা। সুজাও।

চোদ্দ

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু লোকটাকে দেখছে না ওরা।

'আরিস্‌সব্বোনাশ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মিসেস ব্যানার। দুপদাপ করে উঠে গেল আবার সিঁড়ি বেয়ে। দরজা বন্ধ করে দিলো।

'চলে গেল নাকি?' সুজা বললো।

'কি জানি! কাউকে ডাকতে গেল কিনা!'

খানিক পরে আবার দরজা খুললো। সিঁড়িতে চাপা পদশব্দ, বোঝা গেল, সাবধানে পা পা করে নামছে। নিশ্চয় কোনো অস্ত্র-টস্ত্র নিয়ে এসেছে।

প্রায় সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে শব্দ, সুজাকে বেরোনোর ইশারা করলো রেজা। নিজে বেরোলো লাফ দিয়ে।

মিসেস ব্যানারের হাতে শটগান। রেজাকে দেখেই টিপে দিলো ট্রিগার। নিশানা করার প্রয়োজন মনে করেনি। ফলে গুলি ফস-

কালো। এই সুযোগে ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে দু'দিকে সরে গেল দুই ভাই। বন্ধ ঘরে বন্দুকের আওয়াজকেই কামানের আওয়াজ মনে হলো।

মুখ নিচু করে রেখেছে দু'জনে। আবার গুলির আশঙ্কা করছে। কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই। স্তব্ধ নীরবতা। ব্যাপার কি? আস্তে মুখ তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো রেজা। সিঁড়ির গোড়ায় নেতিয়ে পড়ে আছে মিসেস ব্যানার। শটগানটা পড়ে আছে পায়ের কাছে।

'মরে গেল নাকি?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রেজা।

'না বোধহয়। বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো খেয়েছে পেটে। বন্দুক চালাতে জানে না আরকি।'

নড়ে উঠলো মিসেস ব্যানার।

ছুটে এলো সুজা। এক থাবায় মেঝে থেকে তুলে নিলো বন্দুকটা।

মিসেস ব্যানার উঠে বসলো। 'কি করবে আমাকে?' সামান্যতম ভয় পায়নি। স্বামীর মতোই ঠাণ্ডা মাথা, স্নায়ুর জোর অসাধারণ।

'বাঁধবো,' বলে মেঝে থেকে দড়ি কুড়িয়ে আনলো রেজা। এগুলো দিয়েই ওদেরকে বাঁধা হয়েছিলো।

একটা চেয়ারে বসিয়ে মহিলাকে বাঁধলো ওরা। আবার গিয়ে ওয়্যারলেস অন করলো রেজা। বললো, 'নিকু, আছো? নিকু?'

সাড়া নেই।

আবার চেষ্টা করলো রেজা।

জবাব এলো না।

'নেই। কি মনে হয়, মেসেজ পেয়েছে?' সুজা বললো।

রাগ করলো রেজা। মিসেস ব্যানারের কাছে এসে দাঁড়ালো।

'দেখো, ভালো চাও তো ছেড়ে দাও আমাকে,' মহিলা বললো। 'আমার কোনো ক্ষতি হলে মিস্টার ব্যানার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমাদের।'

কপাল কুঁচকে গেল রেজার। ভাব দেখে মনে হলো, এইমাত্র অতি গোপন একটা খবর ফাঁস করে দিয়েছে তাদের কাছে মিসেস ব্যানার। ভাইকে বললো, 'জলদি গাদার কাছে চলে যাও। যে-ভাবে পারো, ওদের সময় নষ্ট করাবে। যাতে লটনের পুলিশ এসে গাদার কাছে পায় ওদের।'

'তুমি?'

'আমার জরুরি কাজ আছে,' হাসলো রেজা। 'স্ত্রীকে কতোটা ভালোবাসে ব্যানার পরীক্ষা করবো।'

কথা বাড়ালো না সুজা, সময় কম। একেক লাফে দুটো করে ধাপ ডিঙিয়ে উঠে এলো ওপরে। বাইরে বেরিয়ে ছুটলো পার্কের দিকে।

প্রথম ভাবনা, কুকুরগুলো কোথায়? ছাড়া, না বন্দি। আন্দাজ করলো, বন্দি। কারণ, বর্জ্য ফেলার সময় একবারও ছাড়া দেখেনি ওগুলোকে। গণ্ডগোল করতে পারে, সে-জন্যেই হয়তো আটকে রাখা হয়।

নিরাপদেই পৌঁছলো পার্কের কাছে। বেড়া খোলা। কিন্তু চোখে পড়ার ভয়ে ওখান দিয়ে গেল না। খানিক দূরে বেড়ার নিচ দিয়ে ক্রল করে পার্কে ঢুকলো। গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এলো গাদার কাছে।

পাঁচটা রূপালি ট্যাংকার ঝকমক করছে চাঁদের আলোয়। ব্যানারের জীপটাও আছে। জীপে বসে আছে ব্যানার। হেডলাইট জ্বেলে রেখেছে, ড্রাইভারদের বর্জ্য ফেলার সুবিধের জন্যে।

সুযোগের অপেক্ষায় রইলো সুজা। ব্যানার নেমে সরলেই হয়। চুপে চুপে গিয়ে উঠে পড়বে জীপে। চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আড়াআড়ি রাখবে বেড়ার খোলা মুখের কাছে, যাতে ট্যাংকারগুলো পিছিয়ে এসে সহজে বেরোতে না পারে। জীপটা সরিয়ে বেরোবেই ওরা এক সময়, তাতে সময় নষ্ট হবে। আর এখন সুজার একটাই উদ্দেশ্য, ওদের দেরি করিয়ে দেয়া।

হবে তো? হতেই হবে। কারণ, চারদিকে গাছপালা এমনভাবে ঘিরে রয়েছে, ট্যাংকারগুলো বেরোনোর একমাত্র পথ বেড়ার ওই খোলা মুখ। আর কোনো জায়গা নেই। এতো বড় গাড়ি ঘুরিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে চালানো অসম্ভব, কিছুতেই পারা যাবে না।

ঘাপটি মেরে বসে আছে সুজা। আছে তো আছেই। দশ মিনিট গেল ··পনেরো···বিশ···সুযোগ আর আসে না। ব্যাটা নামবে না নাকি জীপ থেকে? রেজাই বা কি করছে? আসে না কেন? নিকুর আসতে কতোক্ষণ লাগবে? ওর সময় লাগারই কথা। লটনের পুলিশের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করবে, ওরা আসবে অ্যাক্সরেডে, সেখান থেকে···

এক এক করে গিয়ে বর্জ্য ফেলা শেষ করছে ট্যাংকারগুলো। গ্যালন গ্যালন বিষাক্ত তরল ঢেলে মাটি ভেজাচ্ছে, বিষিয়ে তুলছে পরিবেশ। গ্যাস বেরোচ্ছে। উড়ে আসছে সুজার দিকেই। বেশিক্ষণ ওই বিষাক্ত বাতাস ফুসফুসে ঢুকলে বেহুঁশ না হয়ে যায়!—

ভয় হলো তার।

রেজা আসছে না কেন?

আর কারও জন্যে বসে থাকতে পারলো না সে। এমনকি ব্যানারের নামার অপেক্ষাও করলো না। ঝোপের ভেতরে ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো। বর্জ্য ফেলা নিয়ে ব্যস্ত ট্যাংকারের ড্রাইভারেরা, এসময় তাকে দেখবে না।

জীপের কাছে এসে আরও সতর্ক হলো সুজা। চলে এলো ড্রাইভারের পাশের দরজার নিচে। লম্বা দম নিলো। তারপর হঠাৎ উঠে একটানে খুলে ফেললো দরজা। ব্যানারের কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে বের করে তাকে ফেলে দিলো মাটিতে। চোখাচোখি হলো দুজনের। একজনের চোখে বিস্ময়, আরেকজনের দৃঢ়তা।

ওঠার চেষ্টা করলো ব্যানার। গায়ের জোরে তার পেটে লাথি মারলো সুজা, মরিয়া হয়ে উঠেছে। এখন একটা ভুল করার মানে নিশ্চিত মৃত্যু। হুঁক করে বাতাস বেরিয়ে গেল ব্যানারের মুখ দিয়ে, এঞ্জিনের গর্জনে ঢাকা পড়ছে সমস্ত শব্দ, কারও কানে যাচ্ছে না। চিত হয়ে গেল সে।

এইটুকু সময়ই যথেষ্ট। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো সুজা। বন্ধ করে দিলো দরজা। বাঁ পা চলে গেছে ক্লাচ-প্যাডালে, ডান হাত ইগনিশন কী খুঁজছে। কোথায় চাবিটা? তালায় নেই!

ঝটকা দিয়ে আবার খুলে গেল দরজা। মাথা নিচু করার সুযোগ পেলো না সুজা, প্রচণ্ড ঘুসি লাগলো চোয়ালে। প্রায় ছিটকে গিয়ে পড়লো প্যাসেঞ্জার সিটের ওপাশের দরজায়, মাথায় বাড়ি

যাও এখান থেকে

লেগে চোখে অন্ধকার দেখলো। সামলে নেয়ার আগেই পায়ে লাগলো টান। টেনে-হিঁচড়ে বের করা হচ্ছে তাকে জীপের বাইরে।

অনেক চেষ্টায় হাঁটু দুটো বাঁকা করে লাথি মারলো ব্যানারের বুকে।

পেছনে বাঁকা হয়ে গেল ব্যানার, চিৎকার করে উঠলো যন্ত্রণায়। চিত হয়ে মাটিতে পড়তে পড়তেও পড়লো না, সোজা হলো। সুজা তখন ঠিক হয়ে বসার চেষ্টা করছে। সে-ও পারলো না। দু'হাতে তার মাথা চেপে ধরে স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে ঠুকতে শুরু করলো ব্যানার।

এঞ্জিনের গর্জনের মাঝে বহুদূর থেকে যেন মৃদু ক্লিক ক্লিক শব্দ কানে এলো সুজার। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো, এর মধ্যেই যা করার করে ফেলেছে ব্যানার। তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিয়েছে। পেছন দিকে নিয়ে গেছে দুই হাত।

'বেরোও!' গর্জে উঠলো ব্যানার। হাঁপাচ্ছে। হাতকড়া ধরে হিঁচকা টান মারলো। খানিক আগে তাকে যেমন করে মাটিতে ফেলেছিলো, সুজাকেও তেমনি করে ফেললো সে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সুজা। পরিষ্কার হয়ে আসছে মাথার ভেতরটা।

'এই ব্যাটা, তোর ভাই কোথায়?'

'সিনেমা দেখতে গেছে।'

ঠাশ্ শ্ করে চড় পড়লো গালে। পানি বেরিয়ে এলো সুজার চোখে।

'কোথায়?'

যাও এখান থেকে

টিভি দেখছে। ব্যানার নামের এক চোর ঠ্যাঙাচ্ছে পুলিশ

আবার চড় মেরে তাকে থামিয়ে দিলো ব্যানার। 'রসিকতা বের করবো আমি তোর! হারামজাদা!' হাতকড়া ধরে টান মারলো। 'চল।'

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করলো সুজা। 'কোথায়?'

'গাদার মাঝে। প্রতিটি রোমের গোড়া দিয়ে যখন বিষ ঢুকবে শরীরে, যন্ত্রণায় মোচড় খাবি, তখন বুঝবি আমার সাথে লাগতে আসার ফল। চল।'

ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সুজাকে ট্যাংকারগুলোর দিকে নিয়ে চললো ব্যানার। বনের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'রেজা, তোর ভাইকে ধরেছি। বিষের ওপর ফেলে মারবো। ভাইকে বাঁচাতে চাইলে বেরিয়ে আয়।'

আন্দাজেই বললো ব্যানার। তার ধারণা, বনের ভেতরে লুকিয়ে আছে রেজা।

সুজা ভাবলো জবাব আসবে না। কিন্তু সে আর ব্যানার, দু'জনকে অবাক করেই এলো সাড়া, 'ব্যানার, ছেড়ে দাও ওকে! আর তোমার পোষা কুকুরগুলোকে বলো, বিষ না ঢালতে!'

'এই হারামজাদা!' ভীষণ রেগে গেল ব্যানার। 'আদেশ আমি দেবো, না তুই? জলদি বেরিয়ে আয়।'

'বেরিও না, দাদা! খবরদার!' চেঁচিয়ে নিষেধ করলো সুজা। 'মারলে মারুক আমাকে...'

'ব্যানার, এখনও বলছি, ছেড়ে দাও ওকে। আর ড্রাইভারদের কাজ থামাতে বলো।'

'আবারও কথা বলে। আরে ব্যাটা, বুঝতে পারছিস না, তোর ভাই মরবে। তুইও বাঁচবি না...'

'তাহলে মিসেস ব্যানারও মরবে। তোমার বুড়িটা এখন আমার কব্জায়।'

পনেরো

ভয় আর রাগ একই সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠলো ব্যানারের চোখে। তাকে মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ করতে দেখেছে সুজা, কিন্তু এরকম পরিবর্তন দেখেনি। সমস্ত আত্মবিশ্বাস, সমস্ত দৃঢ়তা যেন চোখের পলকে দূর হয়ে গেছে, রক্ত সরে গিয়ে ছাই হয়ে গেছে চেহারা। 'কি-কী বললে...'

'তোমার মিসেসকে ধরে নিয়ে এসেছি আমি,' জবাব এলো। 'বনের মধ্যে বেঁধে ফেলে রেখেছি। সহজে খুঁজে বের করতে পারবে না। ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে যাবে, এই কি চাও?'

জবাব দিলো না ব্যানার।

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো। ড্রাইভারগুলোকে বিষ ঢালতে মানা করো। আমার ভাইয়ের হাতকড়া খুলে দাও।'

কথাবার্তা প্রায় সবই শুনতে পাচ্ছে ড্রাইভাররা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

'দেখো,' ব্যানার বললো, 'তোমরা ছেলেমানুষ। আমাদের

সঙ্গে পারবে না।'

'ছেলেমানুষ ছিলাম। তবে অ্যাক্সরেডে এসে তোমাদের দয়ায় অনেক বড় হয়ে গেছি। ধন্যবাদ। যা বলছি করো, নইলে বুড়িকে আর জীবনে জ্যান্ত দেখবে না।'

'আমার ভাইকে আমি চিনি, ব্যানার,' সুজা বললো। 'ওভাবে কথা বলতে জিন্দেগীতে শুনিনি। বেপরোয়া করে তুলেছো ওকে। এখন ওকে দিয়ে যতো খুশি মানুষ খুন সম্ভব। যা বলছে করো, নাহলে তোমার বউকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকেই হয়তো ঠেলে ফেলে দেবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বনের দিকে চেয়ে হাত তুললো ব্যানার। 'খুলে দিচ্ছি।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি খুঁজতে লাগলো।

'কোন চালাকি করবে না!' হুমকি দিলো রেজা।

চালাকি করলো না ব্যানার। হাতকড়া খুলে দিলো।

'জীপের চাবি?' হাত বাড়ালো সুজা।

'কেন? লেজ তুলে পালাবে?' তিক্ত হাসি হাসলো ব্যানার। 'যাও, তবে বাঁচতে পারবে না। কয়েক ঘণ্টা বেশি বেঁচে থাকবে আরকি, এই যা।'

'ওর হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে দে, সুজা।'

কোন প্রশ্ন করলো না সুজা। ভাই যা করতে বলেছে, নির্দ্বিধায় করলো। তারপর শেকল ধরে ইচ্ছে করেই টান মারলো, জোরে, ব্যথা দেয়ার জন্যে।

'আঁউক!' করে উঠলো ব্যানার।

বন থেকে বেরিয়ে এলো রেজা। হাতে শটগান। ব্যানারের দিকে

তাক করে এগিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে ব্যানারের পকেট থেকে চাবি বের করে নিয়েছে সুজা। জীপে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিলো।

বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ব্যানারকে জীপের কাছে নিয়ে এলো রেজা। গাড়ির গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করলো। ব্যানারের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইছিলো ড্রাইভারেরা, ধমক দিয়ে তাদেরকে মানা করলো সে। রেজাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার স্ত্রী কোথায়?'

হাসলো রেজা। 'তোমার বাড়ির বেসমেন্টেই আছে। হাত-পা বেঁধে ফেলে এসেছি। হাহু হাহু!'

মস্ত ধাপ্পা দিয়েছে তাকে ওইটুকুন ছেলে! রাগে জ্বলে উঠলো ব্যানারের চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'বাঁচতে পারবি না তুই... যেখানেই পালাস...'

'কে পালাতে যাচ্ছে? আমরা তো এখন অপেক্ষা করছি...'

'কিসের?' ব্যানারের চোখে সন্দেহ।

'পুলিশের। খবর পাঠিয়েছে নিকু। ওরা এসে পড়লো বলে। আসতে কতোক্ষণ লাগে?'

'পুলিশ?' হা-হা করে হাসলো ব্যানার। 'খুব ভালো করেছে ছেলেটা। ওরা এসে আমাকে নয়, তোদেরই ধরবে। শেরিফ জন মরিস আমার পালা কুকুর।'

ক্ষণিকের জন্যে সুজা আর রেজার মনে হলো, ব্যানার ঠিকই বলেছে। হয়তো লটনে খবর পাঠাতে পারেনি নিকু। কিংবা কোনো ভাবে শেরিফের কানে গেছে খবরটা। তাহলে ওরাই আগে আস-

বে, তাদের দু'জনকে ধরার জন্যে।

ঢোক গিললো সুজা।

ভয় পাচ্ছে, সেটা প্রকাশ করলো না রেজা। বরং ভয় ঢাকার জন্যেই ধমক দিয়ে বললো, 'কই, তোমার ড্রাইভারগুলোকে এঞ্জিন বন্ধ করতে বলছো না? কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

ব্যানারের আদেশে এঞ্জিন বন্ধ করলো ড্রাইভারেরা।

দূরে এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। গাছের ফাঁকে দেখা গেল হেড-লাইট। দুরুদুরু করছে রেজা-সুজার বুক। সত্যি লটনের পুলিশ আসছে, নাকি বেঈমান জন মরিসের দল।

কাঁচা সড়ক ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আসছে গাড়ি।

'পুলিশ!' বিড়বিড় করলো রেজা।

'পুলিশ হলে সাইরেন বাজাচ্ছে না কেন?' হেসে বললো ব্যানার।

জবাব দিতে পারলো না রেজা। তাহলে কি ব্যানারের কথাই ঠিক?

একটা মাত্র গাড়ি জোরে ছুটে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। ভ্যান। সাইরেন কেন নেই বোঝা গেল। পুলিশ নয়। গাড়ি থেকে নামলো তরুণ র‍্যাঞ্চার।

'মেল!' খুব খুশি ব্যানার। 'সময়মতো এসেছো। দেখি, ওদের হাত থেকে আমাকে ছাড়ানোর একটা ব্যবস্থা করো তো।'

'কিভাবে? বন্দুক তো ধরে রেখেছে তোমার বুকে।'

'একটা বুদ্ধি বের করো। দরকার হলে বোঝাও ওদেরকে। কতো টাকা হলে ছাড়বে।'

'না, হ্যারি, আমি সেটা করবো না,' মাথা নাড়লো ব্রোন। 'তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। আর যাতে করতে না পারো সেটাই দেখবো। পুলিশ আসছে।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না সুজা আর রেজা। সত্যি বলছে লোকটা? নাকি ওদেরকে ধাপ্পা দেয়ার জন্যে কোনো রকম চালাকি?

'পুলিশ আসছে জানলেন কিভাবে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'এদিকেই আসছিলাম। রেডিও খোলা ছিলো। সাধারণত চোদ্দ নম্বর চ্যানেলে কথা বলে হ্যারি। ওর নির্দেশ শোনার জন্যে অন করে রেখেছিলাম। কথা শুনলাম, তবে ওর নয়, তোমার আর নিকুর। খানিক পরেই শুনলাম, লটনের পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে নিকু। যদি ওর কথায় গুরুত্ব না দেয়? তাড়াতাড়ি আমিও ছুটলাম লটনে।'

সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, কাঁচা সড়ক ধরে এগিয়ে আসছে একসারি গাড়ি।

বন্দুক বুকে ঠেকিয়ে রাখা সত্ত্বেও পালানোর চেষ্টা করলো ব্যানার। পারলো না। তিনজনের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারলো না সে। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। পুলিশের সাই-রেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে ড্রাইভারেরা, হারিয়ে গেছে বনের ভেতরে।

পার্কে ঢুকে থামলো গাড়িগুলো। ঝটাঝট খুলে গেল দরজা। লাফিয়ে নেমে এলো অস্ত্রধারী পুলিশেরা। উদ্যত রিভলভার হাতে এগিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় অফিসার। পরিচয় দিলেন, 'আমি অফি-

সার ম্যাকনার, লটন পুলিশ।'

'আপনি এখানে কি করছেন?' ব্যানার বললো। 'এটা আপনার এলাকা নয়। এখানে আপনার কোনো অধিকার নেই। অ্যাপ্ল-ব্লেডের নিজস্ব শেরিফ আছে...'

'আছে। একটা চোর। অনেকদিন থেকেই ওর বদনাম কানে আসছিলো আমাদের, প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছিলাম না। ওর বিরুদ্ধে সাক্ষীও পাচ্ছিলাম না। এখন পেয়েছি, মিসেস গার্ড-নার আর তার ছেলে। অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছি শেরিফ আর তার দুই ডেপুটিকে।'

'বেশ করেছেন। আপনার ডিপার্টমেন্টের লোক আপনারা ধরে-ছেন। এখন এই ছেলেদুটোকে ধরুন। ওরা জোর করে আমাকে...'

হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে ইশারায় কয়েকজন পুলিশকে ডাকলেন অফিসার। তাদের নিয়ে চলে গেলেন ট্যাংকারগুলোর কাছে। সাবধানে ঘুরে দেখে এলেন বনের কিনারে, যেখানে বর্জ্য ফেলা হয়েছে। ফিরে এলেন। বললেন, 'ন্যাশনাল পার্ক নষ্ট করার অপরাধে আপনাকেও অ্যারেস্ট করলাম, মিস্টার ব্যানার।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। শুধু আপনাকেই নয়, টম ডেনভার আর নীল হ্যামার-কেও একই অপরাধে ধরেছি।'

ঝড়ের গতিতে কাজ সেরেছে লটনের পুলিশ, অবাক হয়ে ভাবলো রেজা আর সুজা। কোনো ফাঁক রাখেনি, কাউকে ছাড়েনি। ট্যাং-কারের ড্রাইভারেরাও পালাতে পারবে না, ধরা পড়বেই।

'প্রমাণ করতে পারবেন না, আমরাই করেছি।'

'পারবে,' ব্রোন বললো। 'আমি সাক্ষী দেবো। আমার র‍্যাঞ্চ, রুবি নদীর পানি নষ্ট করার জন্যেও কেস করবো আমি তোমার বিরুদ্ধে।'

হেসে উঠলো ব্যানার। 'তাহলে তোমারই ক্ষতি। আমাদের সঙ্গে তুমিও ছিলে।'

'ছিলাম,' কালো হয়ে গেল ব্রোনের মুখ। 'সেকথা পুলিশকে বলেছি আমি। জেলে গেলে যাবো। অ্যাক্সরেডকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করলাম, এটাই আমার সান্ত্বনা।'

আরেকটা গাড়ি এসে ঢুকলো পার্কে, একুশ বছরের পুরনো। গাড়ি থেকে নেমে এলো নিকু আর শেলি।

দৌড়ে এলো নিকু। রেজার দিকে চেয়ে হাসলো। 'অঙ্কটা ভালোই করেছি, তাই না? ফল মিলেছে।'

'হ্যাঁ, মিলেছে,' রেজাও হাসলো। 'সব কৃতিত্ব তোমার।'

শেলি বললো, 'হ্যারি ব্যানার, এই দিনটির অপেক্ষায়ই ছিলাম আমি। আমার স্বামীকে যেদিন মেরেছো, সেদিনই কসম খেয়েছি, তোমাকে আমি ছাড়বো না। গলায় দড়ি বেঁধে কুকুরের মতো টানতে টানতে নিয়ে যাবে তোমাকে পুলিশ, না দেখা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।'

'ভুল করছো, শেলি গার্ডনার,' ব্যানার বললো। 'তোমার স্বামী পাহাড় থেকে পড়ে...'

'মারা গেছে, তাই না? আপনা-আপনি পড়েনি। ঠেলে ফেলে দিয়েছো।'

'মিসেস গার্ডনার ঠিকই বলেছেন, অফিসার,' রেজা বললো।

'আমাদের কাছে সেকথা স্বীকার করেছে হ্যারি ব্যানার। আমার আর আমার ভাইয়ের কাছে।'

'কে তোমরা?'

পরিচয় দিলো রেজা। বাবার পরিচয়ও দিলো।

'হুঁ,' মাথা দোলালেন অফিসার। 'রেপোর্টে খোঁজ নিলেই জানতে পারবো। তোমাদের কথা ভালোই বলেছেন মিসেস গার্ডনার···তাহলে এবার যাওয়া যাক···'

'এক মিনিট, স্যার,' হাত তুললো রেজা। 'মিস্টার ব্রোনকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করো।'

'মিস্টার ব্রোন, আপনার ভ্যানে একটা চিঠি দেখেছি আমরা। তাতে ক্যানারি নদী থেকে পানি আনার কথা বলা হয়েছে। কেন?'

'অন্যখান থেকে পানি আনার কথা ভাবছিলাম,' ব্রোন বললো, 'আমার গরুমোষের জন্যে।'

'কেন? রুবিই তো আছে।'

'আছে। কিন্তু পানি আর পানি নেই, বিষ হয়ে গেছে। খেলেই মরবে।'

'কি করে জানলেন? বর্জ্য ফেলার জায়গা থেকে রুবি অনেক দূর।'

'জানি আমি। বাবা প্রায়ই বলতো, ব্যানারদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে। তার কারণ, রুবির পানির উৎস তাদের জায়গায়, মাটির তলার একটা ঝর্না দিয়ে বয়ে আসে। হ্যারি বর্জ্য ফেলা আরম্ভ করলে আতংকিত হয়ে গেলাম। রুবি মরলে আমরাও মরবো। নীল হ্যামার আর টম ডেনভারের র‍্যাঞ্চের ভেতর দিয়েও

বইছে নদীটা। বুঝলাম, নদীটাকে নষ্ট করবে হ্যারি ...'

'মিথ্যে কথা!' বাধা দিলো ব্যানার।

'না, মিথ্যে নয়,' বলে, আবার রেজার দিকে ফিরলো ব্রোন। 'আমরা তিনজন মিলে গেলাম হ্যারির কাছে। তাকে অনুরোধ করলাম, বর্জ্য না ফেলার জন্যে। কিন্তু তখন কোম্পানির সঙ্গে গোপন চুক্তিতে সই করে বসে আছে সে। অনেক টাকা দিয়েছে কোম্পানি। আমরা বললাম, বর্জ্য ফেলে আমাদের র‍্যাঞ্চ নষ্ট করতে দেবো না। ও একটা প্রস্তাব দিলো। বললো, গোপনে পার্কে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। টাকা পাইয়ে মুখ বন্ধ করলো আমাদের।'

'বুঝলাম,' রেজা বললো। 'আপনি ব্যানারের টাকাও খেতে চেয়েছেন, র‍্যাঞ্চও চালাতে চেয়েছেন। এ-জন্যেই ক্যানারি থেকে পানি আনতে চাইছিলেন তো?'

'বললে একটা প্রশ্ন করবে,' বাধা দিলেন ম্যাকনার, 'এখন দেখি একের পর এক করে চলেছো। রাত অনেক বাকি। আজ আর লটনে ফিরছি না। চলো, অ্যাক্সরেডে গিয়ে সব শোনা যাবে।'

'চলুন,' শেলি বললো। 'প্রচুর কফি আছে কাফেতে।' রেজা আর সুজার দিকে ফিরে বললো, 'থ্যাংকস।'

'কাজ এখনও শেষ হয়নি, বোন,' রেজা বললো। 'আপনার স্বামীর মৃত্যুর...'

'যা করেছো, এতেই যথেষ্ট। অ্যাক্সরেড ঋণী হয়ে গেল তোমাদের কাছে। পুরো শহরের লোকের যা করার সাহস হয়নি, তোমরা দুটো ছেলে তা সেরে দিয়েছো।'

'আউ। ও কিছু না, ম্যা'ম,' ওয়েস্টার্ন ঢঙে রসিকতা করলো

সুজা।

হেসে উঠলো শেলি, নিকু, রেজা।

'আমাদের গাড়ির কদ্দুর কি করলো ডিন মার্ট, কে জানে,' রেজা বললো।

পরদিন বিকেলের আগে মার্টের গ্যারেজে যেতে পারলো না দু'জনে। তাদের ব্যস্ত রেখেছেন ম্যাকনার। অ্যাক্সিডেন্ট আসার পর যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলতে হলো ওদের। পুলিশের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নেয়া হলো তাদের বক্তব্য।

যা হোক, বিকেলে ছাড়া পেয়ে ধুলোয় ঢাকা পথ ধরে গ্যারেজে চললো ওরা। পড়ন্ত বেলার রোদে ধুলোর রঙ পাল্টে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে রেজা বললো, 'শহরের পরিবেশ বদলে গেছে।'

'হ্যাঁ। লোকে আমাদের সালাম দিচ্ছে, হাসছে।'

পেছন থেকে দৌড়ে এলো উলফ রেন। অগোছালো দাড়ি আঁচড়েছে। গায়ে পুরনো ফ্যাশনের একটা শাদা শার্ট, গলায় স্ট্রিং টাই। অন্যদিন পথে লোক দেখেনি দুই ভাই, আজ অনেককেই দেখছে। বুড়োর ডাকে রেজা আর সুজা থামলে ওদেরকে ঘিরে ধরলো এসে লোকেরা। সবাইকে উদ্দেশ্য করে হাত তুলে পেটুক বুড়ো বক্তৃতা দিতে শুরু করলো, 'বন্ধুগণ, আমাকে ভোট দিয়ে শেরিফ বানিয়ে দেখুন একবার, শহরের হাল বদলে দেবো। সবাই সুবিচার পাবেন আমার কাছে। বেঁচে যাবেন সবাই। আর কাউকে জ্বালাবো না, কাউকে খাবার কিনে দিতে অনুরোধ করবো না। ভোট দিয়ে এক-জন সৎ শেরিফ নিযুক্ত করুন। কথা দিলাম সব সময় সৎ থাকবো

আমি। কারো ওপর অবিচার হবে না, কথা দিলাম…'

'এখুনি সব কথা বলে ফেলছেন কেন?' রেজা বললো। 'কিছু বাকি রাখুন। পরে অ্যাক্সরেডের সব লোকের সামনে ভাষণ দেবেন।'

'তোমরা তো আর শুনবে না।'

'কে বললো? ভোটের সময় চলেও তো আসতে পারি আমরা,' রেজা বললো। 'আমাদের ঠিকানা দিয়ে যাবো। সময়মতো চিঠি দেবেন।'

খুশি হলো পেটুক বুড়ো। রেজা আর সুজার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো জোরে। বললো, 'আজ রাতে কিন্তু আমার পয়সায় খাবে। অর্ডারও আমি দেবো।'

হেসে ফেললো দুই ভাই। জনতাও।

উলফ রেনকে কাফেতে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে আবার গ্যারেজের দিকে চললো দু'জনে।

'হাই, মার্ট,' গ্যারেজের দরজায় এসে ডাকলো রেজা।

ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে বেরোলো মেকানিক। দুই ভাইকে রেখে হেসে এগিয়ে এলো। 'দেখিয়েছো বটে তোমরা।' রেজার দিকে চেয়ে বললো, 'তুমি করে বলে ফেললাম। আমাকেও আর আপনি আপনি নয়, তুমি এবং মার্টের বদলে শুধু ডিন।'

'তারমানে,' সুজা বললো, 'এতোদিনে সাইনবোর্ডের কথা সত্যি হলো। তিনশো বন্ধুর শহর।'

'হ্যাঁ।' দ্বিধা করলো ডিন। 'দেখো, আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারলাম না। করা উচিত ছিলো।' দূরে তাকালো সে। 'আসলে…আসলে বোনের বিপক্ষে আমি কিছু করতে পারছিলাম

না। ওকে আমি খুব আদর করি। আমার কথা বুঝেছো?'

'হ্যাঁ, অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও কিছু করা যায় না,' রেজা বললো। 'তা আমাদের গাড়ির খবর কি?'

'হয়নি। বাকি আছে,' তাড়াতাড়ি বললো ডিন।

'কি বাকি?'

'ওয়াটার পাম্প লাগানো।'

'পাঁচদিন তো পার করে দিলেন। এখনো আনানো হলো না?' সুজা বললো।

হাসলো মেকানিক। 'এবার হবে। আজ খবর পাঠালে কালই চলে আসবে। কিচ্ছু ভেবো না। কাল নাগাদ সত্যি ঠিক হয়ে যাবে।'

'কসম?'

বুঝতে পারলো না মেকানিক। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো সুজার দিকে।

বুঝিয়ে দিলো রেজা।

হেসে উঠলো তিনজনে।

—: শেষ :—